হাত বাড়ালেই

সুবিধা

Suvida

বর্ষ ১ সংখ্যা ২
বিশেষ পুজো সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

পুজোর তথ্যচিত্র উমার উপাখ্যান

- পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের গল্প : বাণী বসু সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
- রূপক সাহা অনীষা দত্ত নন্দী ■ রিমঝিম-এর বেড়ানো
- পাঁচদিনে পাঁচ কন্যার সাজ ■ গায়িকার হেঁশেল : যে রাঁধে সে গায়-ও

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা
মুদ্রণ
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল
সোসাইটি লিমিটেড
১৩, ১৩/১ এ
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭২
আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com
প্রচ্ছদ
জুন মালিয়া
ছবি সৌজন্যে : অঞ্জলি জুয়েলার্স

চিঠিপত্তর : ৪
সম্পাদকীয় : ৫
শব্দজব্দ : ৫
প্রচ্ছদকাহিনি : ৬
স্বনির্ভর : ৯
কথা ও কাহিনি-১ : ১০
অনীশা দত্ত
হেঁশেল : ১৪
কথা ও কাহিনি-২ : ১৬
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
তুমি মা : ২২
হঠাৎ বিপদ : ২৪
ফ্যাশন : ২৬
গৃহসজ্জা : ২৮
কথা ও কাহিনি-৩ : ৩০
নীলাঞ্জন নন্দী
কাছে-দূরে : ৩৫
কথা ও কাহিনি-৪ : ৩৮
রূপক সাহা
ডাক্তারের চেম্বার থেকে : ৪২
রূপচর্চা : ৪৪
কথা ও কাহিনি-৫ : ৪৬
বাণী বসু
ভূতভবিষ্যৎ : ৫০

ডাক্তারের চেম্বার থেকে ৪২

চিন্তামুক্ত যৌন জীবন

পোশাকি বাহার ২৬

পাঁচদিনে পঞ্চকন্যা

হেঁশেল ১৪

পঞ্চকন্যার পঞ্চব্যঞ্জন

Suvida বর্ষ ১ সংখ্যা ২
বিশেষ পুজোসংখ্যা

সম্পাদকীয়

পুজো মানেই আমাদের মধ্যে একটা উন্মাদনা। পুজোর রোশনাই, আওয়াজ, গন্ধ, মানসিকতা, আবহাওয়া, সবই স্বতন্ত্র। ষোলো আনা বাঙালি। কিন্তু বাঙালি মানে শুধুই পুজো নয়। বাঙালির মননে যেমন রয়েছে দুর্গাপুজো, তেমনই তাঁদের নিজস্ব উৎসব আরও অনেক আছে। সর্ব ধর্মের উৎসবেই বাঙালির আনন্দ উথলে পড়ে। ক'দিন আগেই ঈদের সময় বাঙালি, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মেতে উঠেছিল উৎসবানন্দে। আবার পুজোয় নামবে মানুষের ঢল, আলো, বাজি, খাওয়া দাওয়া। তারপর ছোট্ট গ্যাপ আবার বড়দিনের আনন্দানুষ্ঠান। আর প্রতিটি উৎসবের সঙ্গেই জড়িত থাকে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। যা উন্মোচিত হয় আলোর ছটায়, রান্নার মেনুতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, গানে, ছবিতে, হাতের কাজে, নাচে, নাটকে, সিনেমায়, বইতে।

প্রতিটি উৎসবেরই থাকে আলাদা দিক যা বাঙালি নিজের করে তুলতে সক্ষম মুহূর্তে। তাই বাঙালি জাতি হিসেবে ক্রিয়েটিভ, কিন্তু কায়িক শ্রমেও তাঁরা পিছপা নন। এই যে পুজোর আয়োজন, প্যান্ডেল, মূর্তি গড়ন, ৪ দিন ব্যাপী উৎসব পরিচালনা, এতে কম শ্রম যায় না। সুতরাং উৎসবে যদি আমরা এতটা শ্রম দিতে পারি, তাহলে এবার সময় এসেছে আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের 'অলস' বিশেষণটা ঝেড়ে ফেলার!

শব্দজব্দ ২ উৎসব শ্যামদুলাল কুণ্ডু

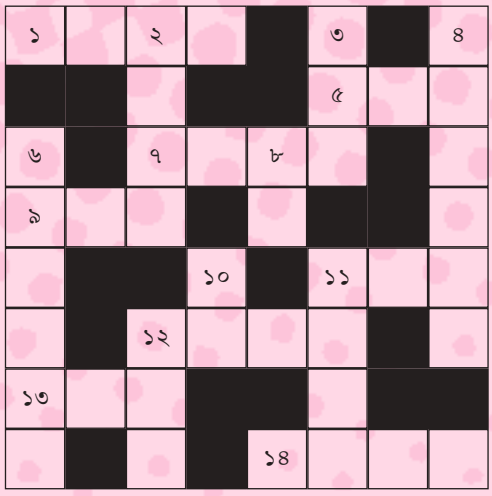

পাশাপাশি

১। দুর্গাপুজার আগের অমাবস্যা, পিতৃতর্পণের দিন ; ভোরে ঘুম ভাঙবে স্বর্ণযুগের শিল্পীদের গান আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শিহরণ জাগানো চন্ডীপাঠে। ৫। সূর্যপুত্র শনি, যাঁর দৃষ্টিপাতে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছিল ৭। দেবীর যিনি অকালবোধন করেছিলেন ইনি তাঁরই পিতা। ৯। মঙ্গলকারী শিব। ১১। দেবতাদের প্রধান মহাদেব। ১২। গণশক্তির অধিদেবতা গণেশ। ১৩। বিষ্ণুর মানসপুত্র, ওঁর অন্যতম অধস্তন পুরুষ মদন, ইনিই আবার মহাদেবের অগ্নিবাণে দগ্ধ হন ; এক রাধিকা সাথী। ১৪। শাশ্বত, পুংশব্দে শিব, স্ত্রী শব্দে দুর্গা।

উপরনিচ

২। যাঁর পুজো বছরের প্রথম দিনেই সেই ভুঁড়ো গণেশ। ৩। যে রাজা বসন্তকালে দেবীদুর্গার পূজা সর্বপ্রথম করেন। ৪। মেয়েদের সিঁদুর খেলা দিয়ে বিদায় অনুষ্ঠান। বিসর্জন, প্রণামি, কোলাকুলিতে শুভেচ্ছা বিনিময়। ৬। কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তাদি আদ্যাশক্তি দুর্গার দশমূর্তি। ৮। লক্ষ্মীর একটি পরিচিত নাম। ১০। দেবীর দক্ষিণ চতুর্থ-হস্তের অস্ত্র, শর। ১১। কার্তিকের সহধর্মিনী। ১২। গজাসুরকে বধ করায় শিবের এক নাম।

সমাধান শব্দজব্দ ২

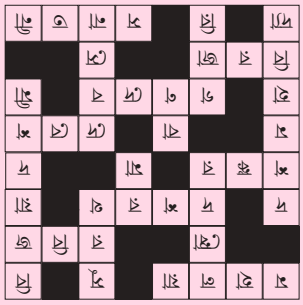

চি ঠি প ত্র

অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ হোক

নমস্কার নেবেন। আমার বান্ধবী বুলবুল হাতে ধরিয়ে দিল 'সুবিধা'-র প্রথম সংখ্যা। বলল নতুন পত্রিকা বেশ ভাল করেছে পড়ে দেখো। পড়লাম, সত্যিই বেশ সমৃদ্ধ। মলাটসহ পাতাগুলোও বেশ উন্নতমানের। সুদেষ্ণাদি, আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। এবার 'সুবিধা'র কথায় আসি। 'শব্দজব্দ'-র 'সমাধান'-টা একই সঙ্গে না দিলে ভাল হয়। পরের সংখ্যায় 'সমাধান'-এর জন্য আগ্রহ থাকবে। 'সুবিধা'-র সঙ্গে দেওয়া কুপনটি ভরে পাঠাতে গেলে, পরপৃষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বাদ পড়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কুপনটি এমন জায়গাতে ছাপা হোক, যেটা কেটে নিলেও পত্রিকার গুরুত্ব এতটুকুও কম হবে না বা সংরক্ষণ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর একটা বিষয় সংযোজিত হলে ভাল হয়। সচেতনভাবে কিছুটা রাজনৈতিক আলোচনা যদি থাকে, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানের মহিলারা রাজনীতি সম্বন্ধে একটু তথ্য পেতে পারি বা রাজনীতির প্রতি কিছুটা আকর্ষণ বোধ করতে পারি। সামগ্রিক সুন্দর ও সম্পূর্ণ হোক 'সুবিধা'-র প্রতিটি সংখ্যা। অঙ্কুর থেকে বৃক্ষে পরিণত হয়ে উঠুক। শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল।

সূর্যশিখা ঘোষ, কলকাতা-৮৪

অনবদ্য হেঁশেল

সুবিধা প্রথম সংখ্যা পড়লাম। ভালই লেগেছে, আপনি বলেছেন জানাতে, এই পত্রিকার কী ভাল কী খারাপ, তা জানাতেই চিঠি লেখা। পত্রিকাটি খারাপ বলার স্পর্ধা নেই। কারণ এর সম্পাদক স্বয়ং আপনি, সুদেষ্ণাদি। তবুও একটা আর্জি জানাচ্ছি পত্রিকাটিতে খেলা সংক্রান্ত কিছু থাকলে আরও ভাল লাগত। আশাকরি দ্বিতীয় সংখ্যায় এইরকম কিছু পাবো। আমি একজন গৃহবধূ। দুপুরের অবসরে এরকম একটা পত্রিকা পেয়ে দারুণ আনন্দিত। হেঁশেলে 'ইলিশের পঞ্চব্যঞ্জন,' দিয়ে কর্তার মন জয় করতে পেরেছি। প্রচ্ছদ কাহিনি 'বর্ষা ৩০' পড়ে আমার মতো অনেকেই উপকৃত হবেন এটা আমার বিশ্বাস। পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করে চিঠি শেষ করলাম।

কৃষ্ণা ব্যানার্জি, ঘুশুড়ি, হাওড়া

বিষয় বৈচিত্র্যে অসাধারণ

'সুবিধা' একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক অনন্য পত্রিকা। মূলত নারীদের জন্য হলেও এটা সাংসারিক ও সামাজিক মর্যাদার পত্রিকা। একের মধ্যে বৈচিত্র্যময় বিষয় বস্তুর সম্ভার। প্রতিটি বিষয়ই প্রয়োজনীয় এবং লেখাগুলোও চমৎকার। ।এর মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রসও আস্বাদিত হয়। পত্রিকাটি সবদিক থেকেই সুন্দর। পত্রিকার সাফল্য কামনা করি।

ডাঃ বিপ্লব বসু, বর্ধমান

খেলাধূলার খবর চাই

'সুবিধা' পত্রিকাটি সবদিক দিয়ে খুব ভাল, খুব সুন্দর। পত্রিকাটি দু'মাস অন্তর প্রকাশিত হলে ভাল হবে। এছাড়া খেলাধূলা সংক্রান্ত একটি বিভাগ সংযোজন করলে আরও ভাল হবে।

কিরণময় মিত্র,পূর্বাচল, কলকাতা-৯৭

চিঠি চাই চাই মতামত

চিঠি লিখুন, জিতুন ১০০০ টাকা

সুবিধার দ্বিতীয় সংখ্যা এটি। এই পত্রিকার সাফল্য আপনাদের হাতে। তাই বলছি কী বন্ধু, চাই আপনাদের সহযোগিতা, পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে। চিঠি লিখে বা ই-মেল করে জানান এই পত্রিকার কী ভাল, কী খারাপ!

যাঁদের চিঠি আমরা আমাদের এই পত্রিকায় প্রথম চিঠি হিসেবে ছাপাব তাঁদের দেওয়া হবে হাজার টাকা উপহার! এ ছাড়া প্রথম ১০০টি চিঠির প্রেরককে দেওয়া হবে ৫০০টাকা করে পুরস্কার। চিঠির সঙ্গে আমাদের দেওয়া কুপনটি ভরে পাঠাবেন।

ধন্যবাদ

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

নাম ....বয়স.....................

ঠিকানা ....

কী করেন ....

প্র চ্ছ দ কা হি নি

পুজোর তথ্যচিত্র
উমার উপাখ্যান

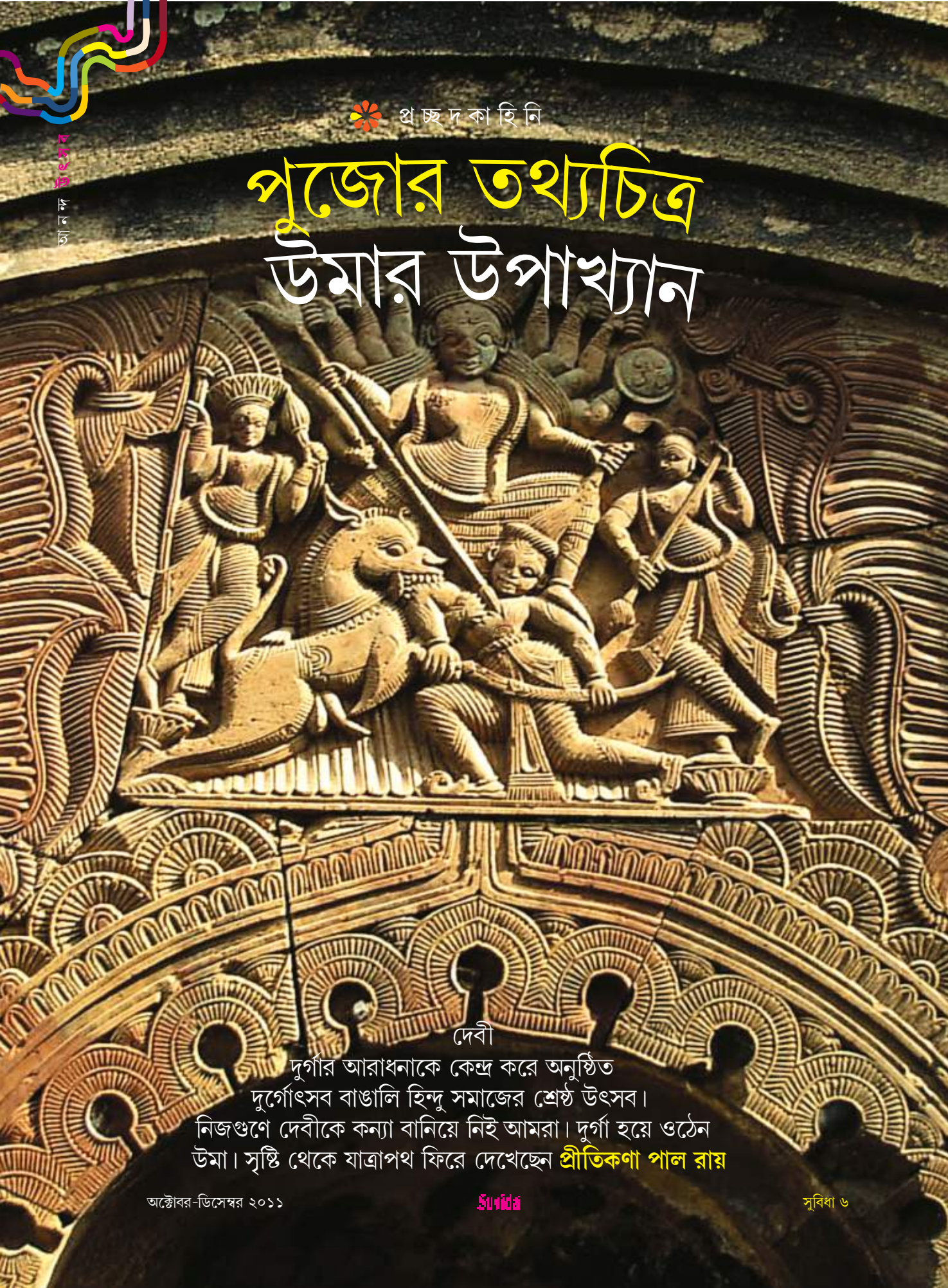

দেবী
দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত
দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব।
নিজগুণে দেবীকে কন্যা বানিয়ে নিই আমরা। দুর্গা হয়ে ওঠেন
উমা। সৃষ্টি থেকে যাত্রাপথ ফিরে দেখেছেন **প্রীতিকণা পাল রায়**

‘আশ্বিনের শারদ প্রাতে
বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর
ধরণীর বহিরাকাশে
অন্তরিত মেঘমালা
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত
জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমনবার্তা।’

শরৎকালে একটা যুদ্ধ হয়েছিল রাম আর রাবণের মধ্যে। রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা রামকে দুর্গাপুজার পরামর্শ দিলে রামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন ঘটান। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠদিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশম দিন অর্থাৎ দশমী অবধি পাঁচদিন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হলেও, দেবীপক্ষের সূচনা হয় অকালে। পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন— যেটি মহালয়া নামে পরিচিত। আর মহালয়া ও মহিষাসুরমর্দিনী বাঙালির হৃদয়ে আজ সমার্থক শব্দ। আকাশবাণীর এই বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠানের মূর্চ্ছনা ইথার তরঙ্গ মারফত বাতাসে ছড়িয়ে পড়া মাত্র যেন আমাদের শরীরের প্রতিটি রোমকূপ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হল এই দুর্গাপুজো। মহালয়া থেকে যার প্রকৃত সূচনা এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় যার সমাপ্তি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত কিংবদন্তী অনুসারে দুর্গোৎসবের প্রবর্তক স্বয়ং কৃষ্ণ— প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। দেবী ভাগবত অনুসারে ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু পৃথিবীর শাসনভার পেয়ে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। তবে, দুর্গাপুজো সংক্রান্ত কাহিনিগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও লোকমান্য হল মার্কণ্ডেয় পুরাণে ‘দেবী মাহাত্ম্যম’-এ বর্ণিত তিনটি কাহিনির মধ্যে মহিষাসুর বধের কাহিনিটি। কিন্তু রামের অকালবোধনের ষষ্ঠীর দিন থেকে বিজয়াদশমীর রাবণবধের দিনটি কী করে যে বাঙালির মনে দুর্গার মহিষাসুর বিজয়ের সঙ্গে মিশে গেল তা বোধহয় আমরা কেউ আর গভীরভাবে ভাবি না। এটার সঙ্গে মূল পুরাণের কোনওই যোগাযোগ নেই। এমনকী বাল্মিকী রামায়ণে রামের দুর্গাপুজোর কথার উল্লেখ নেই— উল্লেখ আছে পরবর্তী কৃত্তিবাসী রামায়ণে।

শ্রী শ্রী চন্ডীগ্রন্থে বর্ণিত দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের কাহিনি সবার জানা থাকলেও আর একবার বাকি রচনার সূত্রধর হিসাবে সংক্ষেপে বর্ণিত হল। পুরাকালে মহিষাসুর দেবগণকে একশতবর্ষব্যাপী এক যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিলে, বিতাড়িত দেবগণ প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে শিব ও নারায়ণের কাছে উপস্থিত হন প্রতিকারের আশায়। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনি শুনে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমন্ডল ভীষণাকার ধারণ করে। প্রথমে বিষ্ণু ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমন্ডল থেকে এক মহাতেজ নির্গত হয়। সেই সঙ্গে ইন্দ্র ও অন্যান্য উপস্থিত দেবতাদের শরীর থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হয়। হিমালয় শিখরে নিহত ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট তেজ পুঞ্জ একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করে। কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূত হওয়ায় এই দেবী কাত্যায়নী নামেও পরিচিত। এক এক দেবের প্রভাবে দেবীর এক এক অঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক দেবতা তাঁদের আয়ুধ বা অস্ত্র দেবীকে দান করেন। আর হিমালয় দেবীকে তাঁর বাহন সিংহ দান করেন। এই দেবীই অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মীরূপে মহিষাসুর বধের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শ্রী শ্রী চন্ডী অনুসারে এই মহালক্ষ্মীই দেবী দুর্গা। তবে বাঙালিরা এঁকে দশভূজারূপে পূজা করে থাকেন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, বাংলার দেবী দুর্গার যে প্রচলিত মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায়, সেটি পরিবার সমন্বিতা অর্থাৎ সপরিবার দুর্গার মূর্তি। হয়তো বাঙালির চিরকালীন সুখী ও ঐক্যবদ্ধ পরিবারমনস্কতার ছাপ ঈশ্বরের আরাধনাতেও পড়েছে। অন্যথা পুরাণে এর কোনও উল্লেখ নেই।

হিন্দুশাস্ত্রে ‘দুর্গা’ নামটির ব্যাখ্যা রয়েছে এভাবে ‘দ’ অক্ষর দৈত্যনাশক, ‘উ’ কার বিঘ্ননাশক, ‘রেফ’ রোগনাশক, ‘গ’ পাপনাশক ও ‘আ’ ভয় ও শঙ্কানাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়— শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। শ্রী শ্রী চন্ডী অনুসারে এই দেবীই ‘নিঃশেষ দেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যাঃ’ বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

এই মহাশক্তি ও তাঁর বাহনের সিংহনাদে ত্রিভুবন কম্পিত হয়ে ওঠে। মহিষাসুর সেই প্রকম্পনে ভীত হয়ে প্রথমে তাঁর সেনা দলের বীরযোদ্ধাদের পাঠাতে শুরু করেন দেবী ও তাঁর বাহন সিংহ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে একে একে সব যোদ্ধা ও অসুরসেনাকে বিনষ্ট করতে শুরু করেন। তখন মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে রত হন। যুদ্ধকালে ঐন্দ্রজালিক মহিষাসুর নানা রূপ ধরে দেবীকে বিমোহিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেবী সেই সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তখন মহিষাসুর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে প্রবল গর্জন করতে শুরু করেন। দেবী বলেন— গর্জ গর্জ ক্ষণং মূর মধু যাবৎ পিবাম্যহম। ময়া ত্বয়ি হতেহত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ।। অর্থাৎ, রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন করে নে। আমি তোকে বধ করলেই দেবতারা এখানে শীঘ্রই গর্জন করবেন। শেষ অবধি দেবী মহিষাসুরের ওপর চড়ে তাঁর কণ্ঠে পা দিয়ে শূল দ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁকে বধ করেন। অসুরসেনা হাহাকার করে পলায়ন করে এবং দেবতারা স্বর্গের অধিকার ফিরে পেয়ে আনন্দধ্বনি করতে থাকেন এবং শ্রী শ্রী দুর্গার জয়ধ্বনি দিতে থাকেন যা গর্জন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ত্রিভুবনে। এহেন মহাশক্তির আরাধনা যে, যে সে ব্যাপার নয়, বোঝাই যায়। এক শতক আগেও বাঙালি গৃহস্থ বাড়িতে তাই দুর্গাপুজো যেভাবে পালিত হত তা ছিল অসাধারণ। কিছু কিছু বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এখনকার সার্বজনীন দুর্গাপুজোয় আড়ম্বর প্রচুর থাকলেও সে আন্তরিকতা ও অনুষঙ্গের অভাব দেখা যায়। সে সময় দুর্গাপুজোর সূচনা হত

পুজোর মাসখানেক আগে থেকে-শুভ দিনে কুম্ভকাররা প্রতিমা গঠনের কাজে হাত দেওয়ার সময় থেকে। প্রধান পুজোর প্রায় এক পক্ষ আগে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতেই অনেক বাড়িতে 'কল্পারম্ভ' শুরু হত—অর্থাৎ প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত পুজো ও চন্ডীপাঠ। বর্তমানে দীর্ঘকালব্যাপী উৎসব দেখা না গেলেও আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী থেকে সব পুজো বাড়িতেই পুজোর মরশুম লেগে যায়। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বেল গাছের তলায় দেবীর জাগরণ। দেবতাদের শয়নকালে (আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস) অসময়ে দেবীর বোধন করেছিলেন রামচন্দ্র তাই শাস্ত্র মতে এটি অকালবোধন নামেই পরিচিত।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস বা বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্য দেবীর অঙ্গ সংস্কার। মন্ত্রপূত চন্দন, তেল, হলুদ প্রথমে শালগ্রাম ও ভূমি স্পর্শ করে ক্রমে হৃদয়, মস্তক, শিখা, নেত্রদ্বয়, কবচদ্বয়, নাভি, হস্তাঙ্গুলি ও পদাঙ্গুলি স্পর্শ করানো হয়। উপাচার হিসাবে আরও থাকে মৃত্তিকা, শিলা, ধান্য, দুর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, সিঁদুর, কাজল, গোরচনা, শ্বেত সর্ষে, সোনা, রুপো, তামা, চামড়, দর্পণ, দীপ।

সপ্তমীর পুজো শুরুর আগে সকালে পুজোমন্ডপে কলাবউ বা নবপত্রিকা প্রকাশ একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। অবগুণ্ঠনবতী নববধূর বেশে সজ্জিত শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হলুদ রঙের সুতো দিয়ে বাঁধা কলা প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপের অধিষ্ঠানরূপী নয়টি বিভিন্ন গাছের চারার শাস্ত্রীয় নামই নবপত্রিকা। নয়টি গাছের মধ্যে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মানী, কচুর কালী, হলুদের দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্ডিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা ও ধানের লক্ষ্মী।সমবেতভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা। নবপত্রিকার এই সমস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা পূজিত হয়ে থাকেন। কাছাকাছি নদী বা জলাশয় থেকে নবপত্রিকাকে স্নান করানো হয় অথবা মণ্ডপেই উষ্ণোদকাদি মিশ্রিত জলে স্নান করানো হয়। গণেশের প্রতিমার পাশে কলাবউ স্থাপিত হয়, তাই সাধারণের ধারণা, কলাবউ গণেশের স্ত্রী। কাঁসার তৈরি দর্পণের ওপর অধিষ্ঠিত মহাস্নানের পর দেবীর প্রধান পুজো। তবে দেবীর মহাস্নান দুর্গাপুজোর একটি বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান। এর উপকরণের বৈচিত্র লক্ষ্য করার মতো। শঙ্খজল, গঙ্গাজল, উষ্ণজল, গন্ধজল, রজতজল, স্বর্ণজল, মুক্তাজল, শর্করাজল, বৃষ্টিজল, শিশিরজল, গজদন্তমৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, গণিকাদ্বার মৃত্তিকা, চতুষ্পথ মৃত্তিকা, প্রভৃতি বিচিত্র বস্ত দ্বারা দেবীকে স্নান করানোর নিয়ম আছে। এছাড়াও স্নানের অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন রকমের বাজনা ও রাগের উল্লেখ আছে। যেমন, বৃষ্টিজলের দ্বারা স্নানের সময় ললিত রাগ ও বিজয় বাদ্য। নির্ঝর জলের বেলায় বরাড়ী রাগ ও শঙ্খ বাদ্য। স্বাভাবিকভাবেই এখন স্নানের বাজনার সেই বৈচিত্র নেই। স্নানের দ্রব্য সংগ্রহের সেই ব্যগ্রতা নেই— দশকর্ম ভাণ্ডার থেকে যা দেওয়া হয়, তাতেই কাজ চালানো হয়।

প্রতিদিনের পুজো শেষে ও সন্ধ্যায় আরতির উৎসব। এটি দেবীপুজোর বিশিষ্ট অঙ্গ। আরতির প্রধান উপকরণ পঞ্চপ্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, পুষ্প এবং বিল্বপত্র এবং ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। ধূপ-ধুনা ও কর্পূরের বাতির ব্যবহারও দেখা যায়। প্রথমে দেবীর পদতলে চারবার, তারপর ক্রমাণ্বয়ে নাভিদেশে দু'বার, মুখমণ্ডলে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার এইসব জিনিস ঘুরিয়ে আনার নিয়ম।

দেবীপুরাণ ও শ্রী শ্রী চণ্ডী অনুসারে বলা হয় মহাষ্টমীর শেষ ২৪ মিনিট (এক দণ্ড) এবং মহানবমীর প্রথম ২৪ মিনিট মোট মোট ৪৮ মিনিট বা দু'দণ্ড সময়কালে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে

ত্রিশূলবিদ্ধ করেন। অন্য মতে মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে রামচন্দ্র রাবণের মুন্ডচ্ছেদ করেছিলেন। তাই অশুভশক্তির বিনাশের সেই কাল স্মরণ করে সন্ধিক্ষণে পশুরূপী অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয়। সন্ধিপূজা দুর্গাপুজোর তাই বিশেষ একটি মুহূর্ত। চালকুমড়ো প্রভৃতি পশুর স্থান গ্রহণ করেছে।

নবমীতে হয় শত্রু বলির অনুষ্ঠান। পিটুলি দিয়ে তৈরি শত্রুর প্রতিকৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করে খড়গ দিয়ে কাটাই শত্রুবলির অনুষ্ঠান। নবমীর দিন শত্রুবধের আনন্দে মাংস-ভাত খাওয়া বাঙালির দুর্গোৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দশমীর দিন সকালে দই-কোর্মা বা দধিকর্মা দই-খই-মুড়কি-কলা একসঙ্গে মেখে দেবীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। এদিনের সংক্ষিপ্ত পুজোর শেষেই দেবী বিদায়ের বিষাদ সুর বেজে ওঠে। দেবী দুর্গা কখন যেন ঘরের মেয়ে উমা হয়ে যায়। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে কন্যা বিদায়ের আগে কেউ কেউ গৃহস্থের কন্যাতুল্য দেবীকে ভিজে ভাত ও কচুর শাক এই সাধারণ খাবার নিবেদন করে থাকেন। দেবীর বিদায় বরণের ব্যথা হৃদয়ে চেপে রেখে সাধবা নারীরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠে। দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থণা করেন— যেমন শাঁখা-সিঁদুর সমণ্বিত সাধবা বেশে দেবী তাঁকে দেখে গেলেন, আগামী বছর যেন একই রূপে এসে তাঁকে দেখেন। সবাইকে কাঁদিয়ে দেবী দুর্গা অবশেষে রওনা দেন পতিগৃহের উদ্দেশ্যে।

চাকরি ছাড়াই রোজগারের সুযোগ!

রোজগার ও সামাজিক দায়িত্ব পালন

জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য 'সুবিধা' পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য প্রতিটি মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জানানো। বিশেষ করে যাঁরা সেভাবে শিক্ষিত বা উন্নত নন তাঁদের।

'সুবিধা' মহিলাদের অগ্রগতির জন্য সর্বদা সতর্ক। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মহিলাদের তথ্য প্রদান করে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চায় সুবিধা। সেইসঙ্গে মা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারবোধ প্রতিটি মহিলার মধ্যে জাগিয়ে তোলার ইচ্ছে সুবিধার।

তাই এসক্যাগ ফার্মা এমন কিছু সদস্য ও কর্মী চাইছে যাঁরা সুবিধা ওরাল কনট্রাসেপটিভ পিল সম্পর্কে মহিলাদের জানাবেন।

আপনি যদি গৃহকর্মী, হোমমেকার, কর্মরত পেশাদার মহিলা বা কলেজ পড়ুয়া হন, এবং কিছু বাড়তি টাকা রোজগার করতে চান তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আমরা কোনও ব্যক্তি, বেসরকারি উদ্যোগী সংস্থা বা দলের খোঁজে রয়েছি যাঁরা 'সুবিধা' সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে। এর জন্য তেমন কিছু খাটতে হবে না। শুধু আপনাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, সহকর্মী, প্রতিবেশী অর্থাৎ আপনাদের চারপাশের মহিলাদের 'পিল' সম্পর্কে কথায় কথায় জানাবেন।

তাঁদের সচেতন করে তুলবেন পিল-এর ক্ষমতা ও সুবিধা সম্পর্কে। 'পিল' সবচেয়ে সফল, নিরাপদ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

আমরা আপনাদের তথ্য ও অন্যান্য সাহায্য দেব। আপনাদের ক্ষমতা অনুযায়ী 'সুবিধা' ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ মহিলাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে কমিশন হিসেবে আপনারা রোজগার করতে পারবেন যথেষ্ট টাকা।

যদি এই উদ্যোগে সামিল হতে চান আপনার বায়োডাটা ও পরিচয় আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

ই-মেল-ও করতে পারেন।

আমাদের মেল আই ডি : eskagsuvida@gmail.com

ইচ্ছে করলে বিনে পয়সায় ফোনও করতে পারেন— **1800 102 7447** এই নম্বরে। ফোন করে, ফোনের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর নথিভুক্ত করুন।

আসুন আমরা সবাই মিলে জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত খবরাখবর ছড়িয়ে দিই ও নিজের সামাজিক দায়িত্ব পালন করি। সেই সঙ্গে রোজগারও!

আমাদের ঠিকানা

Suvida Service Cell
Eskag Pharma Pvt. Ltd.
P-192, Second Floor
Block-B, Lake Town
Kolkata-700089

কথা ও কাহিনি

প্রতিক্ষিপ্ত

অনিশা দত্ত

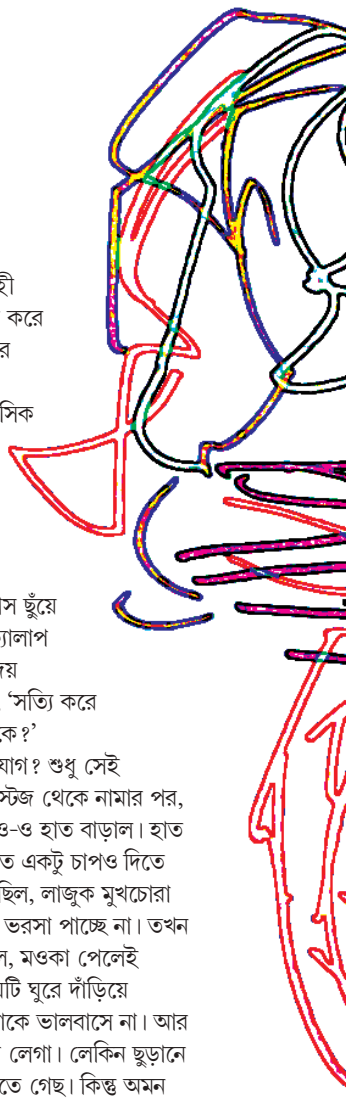

আলোক বাড়ি ঢুকেই স্ত্রী কণিকাকে বলল, 'শুনেছো কান্ড, শান্তনু, সুচরিতাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।' প্রায় আঁতকিয়ে উঠল কণিকা, 'বলো কী? কবে? কে বলল? 'আহা! বলে নি কেউ। আমি আন্দাজ করছি। আসলে, দুজনেই খবর না দিয়ে হাসপাতালে আসছে না তিনদিন।' শান্তনু প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। সুচরিতা ওই হাসপাতালেরই নার্স। বিরক্ত হয়ে কণিকা জবাব দিল, 'এই সব মোটা মাপের ঠাট্টা করো না তো। হাসিও পায় না, গা জ্বলে যায়। ইচ্ছে করলেই ওরা দু'জনে বিয়ে করে নিতে পারে, কোনও বাধা নেই। পালাবার প্রশ্নই ওঠে না।' 'আরে-বাবা, বরাবরের জন্য না পালিয়ে টেম্পোরারি পালাতেও তো পারে। দু'তিন দিনের জন্য দীঘা-মন্দারমণি-বকখালি বা গালুডি। 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী।' এই চল না, আমরা দু'জনে কোথাও বেড়িয়ে আসি এই উইক-এন্ডে।'

'ঢ-ঙ-ঙ' —গাল ফুলিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে, আঁচল উড়িয়ে দেমাকিনী কণিকা ছিটকিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে। আলোক প্রেম-প্রেম মেজাজ নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছিল। মনটাই মাটি হয়ে গেল তার।

পরদিন হাসপাতালে পৌঁছেই আলোক দেখল, শান্তনু ও সুচরিতা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চিত্তে নিবিড় আলাপে নিমগ্ন। আলোক ওদের বিরক্ত করল না। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর, সুচরিতা সরে যেতে, আলোক, শান্তনুকে পাকড়াও করল। 'আর কতদিন এভাবে চালাবি? এবার তো তিনের ঘরে পা রাখতে যাচ্ছিস। আমরা সবাই বিয়ে করে ফেললাম। তুই শুধু-শুধু সুচরিতাকে ঝুলিয়ে রেখেছিস কেন?'

বিব্রত শান্তনু জবাব দিল, 'কী করি বলতো? সুচরিতাকে কিছুতেই খোলাখুলি বলতে পারছি না।'

'আরে, চোখের চাওয়া, ওড়নার হাওয়া, একটু-আধটু আঙুলে ছোঁয়া, এগুলো কি ফেলনা নাকি? তবে, ঠারে-ঠোরে, আভাসে ইঙ্গিতে যে কুঁড়িটি জাগে, তাকে ফোটাতে গেলে, একটু সোচ্চার হতে হবে, না কি!'

'আমি তোমাকে ভালবাসি'—শুনতে একটু বোকা বোকা লাগে ঠিকই তাই 'আই লাভ ইউ' বলাটাই চল। তাহলে, তুই তো সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুত্তর পেয়ে যাবি, 'আই লাভ ইউ টু-উ।'

'যদি তেমন উত্তর না পাই, যদি সুচরিতা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।'

'তোর কী মনে হয়, তেমন সম্ভাবনা আছে?'

'না, তা মনে হয় না। কিন্তু ধর, সাহস করে বলেই ফেললাম। তারপরেও তো সেই টেনশনে থাকা। কেমন করে বিয়ের কথাটা পাড়ব?' 'তাহলে এক কাজ কর, ভালবাসাবাসির কথায় যাস না। সোজাসুজি বল, সুচরিতা তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

পরামর্শটা শান্তনুর মনে ধরল। উৎসাহী আলোক, শান্তনুর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল। তাহলে, বলছিস তো? আজই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেল।'

'আজ? ওরে বাবা, আমার একটু মানসিক প্রস্তুতি তো দরকার। যদি আগামীকাল বলি।'

'বাঃ একদিনে মানসিক প্রস্তুতি এসে যাবে?'

'হ্যাঁ-যাবে।' প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সুর শান্তনুর কণ্ঠে। হঠাৎ ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস ছুঁয়ে গেল দু'জনকে। হাসপাতালের চত্বরে বাক্যালাপ চলছিল। আলোক আরও একটু দুলিয়ে দেয় শান্তনুর হৃদয়। চোখ নাচিয়ে, উৎসুক হল, 'সত্যি করে বল তো, একটা চুমুও কি খাসনি সুচরিতাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শান্তনু, 'কোথায় সুযোগ? শুধু সেই নববর্ষের গানের ফাংশানে ও গান গেয়ে স্টেজ থেকে নামার পর, অভিনন্দন জানাতে হাত বাড়িয়েছিলেম। ও-ও হাত বাড়াল। হাত মেলালাম। ব্যস্ ওইটুকু! সাহস করে, হাতে একটু চাপও দিতে পারিনি।' একটা হিন্দি ফিল্মে শান্তনু দেখেছিল, লাজুক মুখচোরা নায়ক কিছুতেই নায়িকাকে প্রেম নিবেদনে ভরসা পাচ্ছে না। তখন নায়কের এক শুভ চিন্তক পরামর্শ দিয়েছিল, মওকা পেলেই সোজা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধর। যদি মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে তোমাকে এক চড় লাগায়, তবে সে তোমাকে ভালবাসে না। আর যদি বলতে থাকে, 'ছোড়ো না, কোই দেখ লেগা। লেকিন ছুড়ানে কোশিস না করে'— তবে বুঝবে তুমি জিতে গেছ। কিন্তু অমন অভিনব পন্থা প্রয়োগ করার সুযোগ কোথায়? যখন তারা দু'জনে পাশাপাশি বা মুখোমুখি থাকে, অবশ্যই ঘটনাচক্রে, তখনও তো পরস্পরের মনের কথা জানবার উপায় থাকে না। যদিও টেলিপ্যাথি বলে একটা শব্দ রয়েছে। তাই সেদিন শান্তনু জানতে পারেনি, সুচরিতা মনে মনে বলেছিল, 'গানের প্রশংসা নয়, তোমার সান্নিধ্যই আমার অধিক কাম্য।'

শহরের ব্যস্ত অঞ্চলে হাসপাতাল। আর হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টারে সুচরিতা থাকে। শান্তনুর বাড়ি শহরের শেষ প্রান্তে। নিবিড় শ্যামলিমায়। শান্তনুর বাগান রয়েছে। তার আধখানাই লন। নরম কার্পেটের মতো মেক্সিকান ঘাস। মরসুমি ফুল, বাগান আলো করে ফুটে আছে। বাড়িতে ঢোকার আগেই বাগান দেখে শান্তনুর রুচির আভাস পাওয়া যায়। সে কেতাদুরস্ত লোক। সবসময় নিজেও ফিটফাট থাকে। বাড়িঘরও পরিচ্ছন্ন ফুটফুটে। শার্ট প্যান্ট ছেঁড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না শান্তনু। যথেষ্ট পুরনো

হওয়ার ঢের আগেই বাতিল করে। নতুন কিনে ফেলে। যখনই বাড়ি থেকে বের হয়, স্নান করে, ঝকঝকে পোশাকে সুগন্ধি ছড়িয়ে নেয়। মহিলা মহলে শান্তনু এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সুচরিতার কাছাকাছি এসেই তার সমস্ত সাহসের ওপর পর্দা পড়ে যায়। যদিও, সুচরিতা স্বভাবে শান্ত, মুখচোরা। তবু বাকপটু শান্তনু সুচরিতার সামনে বাকরুদ্ধ।

শান্তনুর মা-বাবা প্রয়াত। দিদি আছে। দিদি-জামাইবাবু পুনেতে সেটলড। সুন্দর ছবির মতো বাড়িতে সে একাই থাকে। ঠিকে দাসী-মালি আছে সকাল সন্ধে এসে ঘর গৃহস্থালী ও বাগান সামলে দেয়। তার ড্রইংরুম অতি পরিপাটি করে সাজানো। ঝাঁ-চকচকে মস্ত মস্ত পিতলের ফুলদানি। একদম সোনার মতো উজ্জ্বল। ঝকঝকে মস্ত পিতলের থালায় দুটি সুদৃশ্য পিতলের কামানের মিনিয়েচার, মুখোমুখি—যুদ্ধংদেহি। দেওয়ালে হাতির দাঁতের কারুকার্য খচিত ফ্রেমে বেলজিয়াম গ্লাসের ডিম্বাকৃতি আয়না। দরজা-জানলার মাথায়, পর্দার পেলমেটের ওপর সার সার হুইস্কি, শ্যাম্পেন, ভদকা ইত্যাদির মিনিয়েচার বোতল তার স্টেটাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শান্তনু সঙ্গীতানুরাগী। পিয়ানো-অ্যাকোর্ডিয়ান, পিয়ানো,

সিনথেসাইজার বাজাতে পারে। সুচরিতাও সুকণ্ঠী ও সুগায়িকা। সুচরিতা শান্তনুর পারস্পরিক আকর্ষণের একটি অন্যতম কারণ হল, উভয়ের সংগীতপ্রীতি।

সুদেহী-সুপুরুষ শান্তনু অতীব বন্ধুবৎসল। নিজে সুন্দর খেতে জানে, সুন্দর করে খাওয়াতেও জানে। শান্তনু বলে, তার বাবা নাকি প্রথম জামাইষ্ঠীর পর আর শ্বশুরবাড়ি যেতে চাননি। অনুযোগ হল, তাঁকে নাকি খেতে বসে বাইশবার মাংস চাইতে হয়েছিল। সে নিজে কট্টর মাংসাশী, ভেজিটেরিয়ান খাদ্য তার ভাষায় ঘাস-ফুস। সন্ধ্যায় বন্ধুদের ক্লাবে ডেকেছে। ড্রিঙ্কস এর পর ভরপেট ডিনার। ডিনার প্রায় শেষের দিকে, হঠাৎ শান্তনু চেয়ার থেকে চড়াৎ করে উঠে পড়ল, 'ইস, ভুলেই গিয়েছি, আজ যে আমার একটা ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল।' বন্ধুরা বিদায় নিলে শান্তনু স্বচ্ছন্দে ডিনারের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে বেরিয়ে গেল।

শান্তনু র'হুইস্কি খায়, সোডা বা জল মেশানো নয়। তাও দিনে চার/পাঁচ পেগ। কখনও টলে না। তবে চেহারার চাকচিক্যে ও অত্যন্ত ভদ্র সপ্রতিভ আচার আচরণে মেয়েদের টলিয়ে দেয়। কিন্তু কোনও কমিটমেন্টে যায় না। তার জীবন-দর্শন বলে, 'আসা-যাওয়া দু'দিকেই খোলা রাখ দ্বার, যাওয়ার সময় হলে যেও সহজেই, আবার আসিতে হয় এসো, সংশয় যদি রহে, তাহে ক্ষতি নাই, তবু ভালবাসো যদি বেসো।' তবু, সুচরিতাকে সে যথার্থই ভালবাসে ও কামনা করে।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে অবধি, শান্তনু মনে মনে মহড়া দিতে থাকে। কাল কীভাবে শুরু করবে। প্রথম, সুচরিতাকে একা পেতে হবে। হাসপাতালের ভীড়ে তা কখন সম্ভব হবে, কে জানে? শান্তনু অনেকদিন ভেবেছে, সুচরিতাকে একদিন সন্ধ্যায় চায়ে বা রাতে ডিনারে বাড়িতে ডাকে। কিন্তু সে ব্যাচেলার ও মহিলা বর্জিত গৃহে একা থাকে। কোনও ভদ্রমহিলাকে কি এহেন পরিস্থিতিতে একা ডাকা শোভন হবে? অনেকের সঙ্গে সুচরিতাকেও ডাকা যায়। কিন্তু তাতে তো কোনও সুরাহা হবে না। সুচরিতাকে তো একা পাওয়া চাই।

পরিস্থিতিটা মনে মনে আলোচনা করতেই সাহসী বেপরোয়া শান্তনুর কণ্ঠ কুণ্ঠায় রুদ্ধ হয়ে এল। সর্ব জায়গায় সে আগ্রাসী। কিন্তু সুচরিতার কাছে নয় কেন? কিন্তু না, আর বিলম্ব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার সব বন্ধুই বিবাহিত। সুচরিতা যতই স্বল্পভাষিনী হোক, সে যে শান্তনুকে পছন্দ করে, এটুকু শান্তনু নিঃসংশয়ে বোঝে। তথাপি, 'তবু', 'কিন্তু', 'হয়তো', 'অথচ' ইত্যাদি অব্যয়ের জন্য শান্তনু ভারাক্রান্ত থাকে।

ডাক্তার ও নার্সদের বিশ্রামের জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট আছে সেখানে সুচরিতাকে কোনও না কোনও সময়ে, একা পেলেও পাওয়া যেতে পারে। আর তখন, কোনও মতেই ধানাই-পানাই না করে, সরাসরি, বিবাহের প্রস্তাব দেবে সুচরিতাকে। রাতে শুতে যাওয়ার আগে, শান্তনু ভোর সাড়ে পাঁচটায় ল্যান্ডফোনে ওয়েক-আপ কল দিল। কারণ, আগামীকাল সে একটু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছতে চায়। সারাদিন তাকে সুযোগ খুঁজতে হবে, সুচরিতাকে একা পাওয়ার।

সকালে শান্তনুর ঘুম ভাঙল, টেলিফোনের ঝনঝনানিতে। তবে ওয়েক-আপ কল নয়, সেটি বাজেনি। বাজছে সাড়ে সাতটা, পুনে থেকে দিদি ফোন করেছে। বক্তব্য হল, মধুরিমা নামে এক চমৎকার মেয়ে, বর্তমানে হাউস ইন্টারশিপ করছে। দিদি তার সঙ্গে শান্তনুকে জুড়ে দিতে চায়। ভাই-এর প্রতি তার তো একটা দায়িত্ব আছে, নাকি! তারা সামনের শনিবার সব শান্তনুর বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসছে, তিনদিন। তখনই মধুরিমাকে ডিনারে ডাকা হবে। না-না, দিদি কোনও জবরদস্তি করছে না। একবার দেখতে বা দেখা করতে ক্ষতি কি? ভাল না লাগলে, সেখানেই ইতি। আর যদি ভাল লেগে যায়, তবে দিদি কথা চালাবে। অগত্যা শান্তনুকে বলতে হল সামনের সপ্তাহে তার সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ততা। পরে-পশ্চাতে কোনও একদিন সময় করে, দেখা যাবে এখন। তারপর জামাইবাবু কথা বললেন, কুশল-সংবাদ বিনিময় হল। আদরের ভাগ্নে-ভাগ্নিরাও ছাড়ল না। মামু-মামু করে অস্থির। পাক্কা পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেল, আজও। কাল রাতে, সুচরিতার চিন্তায় এত মশগুল ছিল। শুতে যাওয়ার সময় টেবিলল্যাম্পটা নেভাতে ভুলে গিয়েছিল। এখন, স্যুইচ টিপে বন্ধ করা মাত্র, সেটি সশব্দে ফেটে গেল, ফটাস। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের টুকরো। প্রচুর সাবধানতা সত্ত্বেও, কাঁচ কোড়াতে গিয়ে কাঁচের কুচি বুড়ো আঙুলে ফুটে টলটলিয়ে উঠল এক ফোঁটা রক্ত। টুকটুকে ফরসা শান্তনুর শ্বেতশুভ্র আঙুলের ডগায় টকটকে লাল ফুটকির সৌন্দর্য দেখে, নিজেই মোহিত হয়ে গেল। খুব ছোটবেলায়, সে একবার তাদের গ্রামে, প্রোজেক্টারে ছোট পর্দায় রাধা-কৃষ্ণর পৌরাণিক ছবি দেখেছিল। তাতে একটা দৃশ্যে ছিল, সেলাই করতে করতে রাধার

> ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সুচরিতা। আর সঙ্গে সঙ্গে সুচরিতাকে জড়িয়ে ধরে, তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে, শান্তনু বলে উঠল, 'তোমাকে আমি বিষম ভালবাসি

আঙুলে সূচ ফুটলে, অন্য জায়গায় থাকা কৃষ্ণের আঙুলে রক্ত ফুটে বেরিয়েছিল। মনে মনে মজা পেল শান্তনু। আহা, সুচরিতা তো আন্দাজ করতেই পারছে না, শান্তনু আজ কী বার্তা নিয়ে তার কাছে আবির্ভূত হবে। একেবারে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাবে, সুচরিতার কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে? অপার বিস্ময়, হঠাৎ-খুশির ঝলকানি নাকি পরম প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি। কোন দিকে পাল্লা ভারি হবে! যাই হোক হৃদয়ের গভীরে ডুবে থাকলে চলে না। ঝাড়ু এনে কাঁচের টুকরো সাফ করল সে। এরপর, টেবল ল্যাম্পটা সরাতে গিয়ে, তারে টান পড়ে, সেটিও মাটিতে পড়ে তিন টুকরো হয়ে গেল। অতঃপর সেগুলো কুড়িয়েও ময়লার বালতিতে ফেলে এল শান্তনু। মুখ ধুয়ে, টয়লেট সেরে, প্রাতরাশ বানাতে বসল শান্তনু। টোস্টারে রুটি দিল, গ্যাস জ্বেলে একদিকে ডিমের ওয়াটার পোচ করতে দিল ও অন্যদিকে বসাল চায়ের জল। এমন সময় ডোর বেল। উল্লসিত হয়ে দরজা খুলতে গেল শান্তনু। নিশ্চয়ই কাজের মাসি। যাক ঝটপট ঘরদোর পরিষ্কার হবে। চট জলদি রান্নাও করে দেবে মাসি। সে নিশ্চিন্তে হাসপাতালে বার হবে। কিন্তু হতাশার পর হতাশা। 'তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নেই।' শুধু বারান্দায় রোদ্দুর লুটোপুটি খাচ্ছে। একপাল বাচ্চা চ্যারিটি শোয়ের টিকিট বিক্রি করতে এসেছে। তাদের এড়ানো গেল না। বাচ্চাগুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে চারটে টিকিট কিনতেই হল। ততক্ষণে টোস্ট কটকটে কঠিন। ডিমপুড়ে গেছে। চায়ের জল ফুটে-ফুটে সসপ্যান

খালি। বিরক্ত হয়ে রুটি-ডিম ফেলে দিল শান্তনু। ফ্রিজে নতুন অরেঞ্জ জুসের বোতল রয়েছে। খোলা হয়নি। কী-ওপেনার খুঁজতে পাঁচ মিনিট লাগল। বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে ঠকঠক করে খেতেই, বমি এসে গেল, অসম্ভব টক জ্যুস। মুখ ঠিক করতে বিস্কুটের টিন বার করল শান্তনু। সব মিইয়ে গেছে। রেগে মেগে বাকি বিস্কুটগুলো ঢেলে দিল বালতিতে। সাড়ে-আটটা বেজে গেল। কাজের লোক এলই না। আনাড়ি হাতে, ডেকচিতে জল চাপিয়ে, চাল-ডাল-আলু-ডিম সব একসঙ্গে দিয়ে, স্নান করতে গেল সে। গলায় গান এল স্বতঃস্ফূর্ত। শান্তনু গলা ছেড়ে গান ধরল। 'কাল রাতের বেলা, গান এল মোর মনে, যখন তুমি ছিলে না গো ছিলে না, যখন তুমি ছিলে না মোর মনে...' এবং মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সব তো গোলমাল হয়ে যায়, যখন তুমি আছ আমার সনে। গান শেষ হল না, শাওয়ারের জল গেল বন্ধ হয়ে।

মনে পড়ল, কাল রাতে মন বিক্ষিপ্ত থাকায়, সে পাম্প চালাতে ভুলে গেছে। কোনওক্রমে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেড়িয়ে, পাম্প চালিয়ে এল শান্তনু। স্নান সেরে এসে দেখল, ফ্যান উথলিয়ে পড়ে গ্যাস নিভে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি নব্ ঘুরিয়ে কিচেনের সব দরজা-জানালা খুলে ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে দিল শান্তনু। সে ভেবে দেখল, বিপদ একা আসে না। যত ঝামেলা সব জোট বেঁধে তাকে আক্রমণ করছে আজ। 'মর্নিং শোজ দি ডে'। এই যদি দিনের শুরু হয়, তবে তার কপালে আজ কী আছে, কে জানে। তার ভীরু প্রেমকে আজ সে জয়ের মুকুট পরিয়ে দিতে পারবে তো। সময় হয়ে গিয়েছে, যা হোক কিছু খেয়ে তো নিতে হবে। অতএব, আধসেদ্ধ ভাত-ডাল আলু-ডিমসেদ্ধ মাখন-নুন দিয়ে মেখে কোনওক্রমে গলাধঃকরণ করে, প্রিয়তম শার্টখানি বার করল শান্তনু। দেখল, একটি বোতাম ছেঁড়া। বোতাম সেলাই করতে পাঁচ মিনিট। প্যান্ট পরে বেল্ট বাঁধতে গিয়ে মনে পড়ল, গতকাল বেল্টটা পট করে ছিঁড়ে গিয়েছে। নতুন কেনা হয়নি। আসলে, যেমন-তেমন জিনিস সে কিনতে পারে না। তার চাই, বাজারের সেরা জিনিস! অতএব, সময় দিয়ে সুন্দরতম কোমর বন্ধনী তাকে খুঁজতে হবে, সেই সময় পাবে তিনদিন বাদে।

হুড়োহুড়িতে শার্টের সঙ্গে ম্যাচ করা টাইটিও খুঁজে পেল না শান্তনু। অগত্যা, যেমন তেমন অন্য টাই বাঁধতে বাধ্য হল শান্তনু। তারপর তাড়াতাড়ি মোজা পড়ে, জুতোর ফিতে বাঁধতে এমন টান মারল, ফিতে গেল ছিঁড়ে। অতএব, স্যু-জুতো বাতিল। বিকল্প স্ট্র্যাপ দেওয়া স্যান্ডেলে কাজ চালাতে হল। যা, তার শার্ট-প্যান্ট-টাই-এর সঙ্গে একেবারেই ম্যাচ করল না।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করতে গিয়ে দেখে, তেল প্রায় নিঃশেষ। শান্তনু শৃঙ্খলাপ্রিয় ব্যক্তি। কোনও কাজই সে শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখে না। তার স্বভাবেই নেই। একদিন অন্তর, হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে, সে নিয়মিত গাড়িতে তেল ভরে। তেল নিঃশেষ হওয়ার প্রশ্ন থাকেই না। গতকাল তার তেল ভরার দিন ছিল, কিন্তু গতকাল আলোকের সঙ্গে বিশদ আলোচনার পর থেকে তার মন ছিল উড়ু-উড়ু। প্রজাপতির পাখা। তুচ্ছ তেলের কথা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল।

অতএব, প্রথমেই পেট্রোল-পাম্প। তেল ভরতে ভরতে পেট্রোল পাম্পের ছেলেটি বল, 'স্যর, দু'টো চাকায় হাওয়া কম।' অতঃপর হাওয়া ভরতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই চাকা পাংচার। স্টেপনি বার করে চাকা লাগাতে আরও দশ মিনিট সময়ের অপব্যবহার। এত কান্ড করেও, শেষ রক্ষা হল না। গাড়ি মাঝপথে ব্রেকডাউন। মোবাইলে ফোন করে গাড়িটা গ্যারেজে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হল।

অফিস আওয়ারে ট্যাক্সি পেতে প্রচুর ঝঞ্ঝাট। তবু যা হোক একটা ট্যাক্সি ম্যানেজ করা গেল। প্রায়, হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছেছে, বাঁ দিক থেকে অন্য একটা ট্যাক্সি এসে তার ট্যাক্সিটাকে ঘষে দিল। দরজায় শান্তনুর মাথা ঠুকে গেল। হ্যান্ডেলে হাত চিপ্টে গেল। চিৎকার-চেঁচামেচি, ট্যাক্সি চালকদ্বয়ের একে অন্যের প্রতি দোষারোপ। তারপর, দুই প্রাণবন্ত ট্যাক্সি চালকের হাতাহাতি ও তাদের ঘিরে প্রচুর জটলা।

শান্তনু বুঝে গেল, আজ বড় রকমের বিপর্যয় তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কিছুতেই সে সামাল দিতে পারছে না। প্রায় কাকুতি-মিনতি করে ট্যাক্সি চালকের কাছে পাঁচ সেকেন্ড সময় ভিক্ষা করে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে, ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল শান্তনু। বাকি পথটা হেঁটে হাসপাতালে পৌঁছল। 'সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়, যে জন বুঝে না, তারে ধিক শত ধিক।' কিন্তু যে জন বুঝে, তারও কিছু করার থাকে না। একটু আগে হাসপাতালে পৌঁছতে পারলে, একটা বড় রকমের সম্ভাবনা ছিল সুচরিতাকে একা পাওয়ার। এখন, সেই আশাটি ক্ষীণ হতে হতে প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। শান্ত শান্তনুর মেজাজ চড়তে শুরু করল, আর বশে রইল না।

রেস্ট রুমে পৌঁছানো মাত্র, চোখে আমন্ত্রণ নিয়ে, এক বাক্স থার্মোমিটার হাতে সুচরিতা ঘরে ঢুকল, 'স্যার, এগুলো কোথায় রাখব।' গর্জে উঠল শান্তনু, 'তোমার মাথায়', বলেই থার্মোমিটারের বাক্স সুচরিতার মাথায় ভেঙে দিল। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সুচরিতা। আর সঙ্গে সঙ্গে সুচরিতাকে জড়িয়ে ধরে, তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে, শান্তনু বলে উঠল, 'তোমাকে আমি ভীষন ভালবাসি, সুচরিতা। বিয়ে করবে আমায়?'

হেঁ শে ল

পুজোয় পঞ্চকন্যার পঞ্চব্যঞ্জন

যারা গান গায় তারাও রাঁধে। কথাটা খুবই সত্যি, তাই বাংলা গানের জগতের পাঁচ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁদের প্রিয় খাবারের রেসিপি, দিয়েছেন তাঁরা ষষ্ঠী থেকে বিজয়ার মানানসই খাবারের তালিকা ও বানানোর পদ্ধতি। সব যোগাড় করে একত্রিত করেছেন **দেবস্মিতা মুখার্জি**

সো ম ল তা

ষষ্ঠীর স্ন্যাকস চিজ বলস

কী কী লাগবে

২৫০ গ্রাম সলিড চিকেন শ্রেড করা বা কিউব করা, মাঝারি মাপের একটা পেঁয়াজ, ৮/১০ কোয়া রসুন, সামান্য আদাকুচি, ২-৩টে কাঁচালঙ্কা, স্বাদমতো নুন, গ্রেট করা অর্থাৎ কুচনো চিজ ও সাদা তেল।

কী করে করবেন

প্রথমে চিকেন, পেঁয়াজ, রসুন, আদাকুচি ও কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে মিক্সিতে দিয়ে ঘন আঠালো পেস্ট বানিয়ে নিন। পেস্ট তৈরি হয়ে গেলে আন্দাজমতো নুন এবং একটু সাদাতেল মিশিয়ে ভাল করে মেখে নিন। ছোট ছোট বল বানিয়ে পুর ভরার মতো করে তার মধ্যে গ্রেট করা চিজ ভরে আবার বলের আকারে গড়ে ডুবো তেলে ভেজে স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করুন। দারুণ জমবে ষষ্ঠীর আড্ডা।

শু ভ মি তা

সপ্তমীর মাছ দই মাছ

কী কী লাগবে

৫০০ গ্রাম পাকা পোনা মাছ, দই ১ কাপ, অল্প গোটা গরম মশলা, মাঝারি পেঁয়াজ দুটি (বাটা), আদাকুচি আধ চা-চামচ-বাটা, পরিমাণমতো নুন, স্বাদ অনুযায়ী মিষ্টি, কাঁচা লঙ্কা বাটা, আধ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো।

কী করে করবেন

মাছ পরিষ্কার করে তেলে হাল্কা করে এপিঠ ওপিঠ ভেজে তুলে নিন। ওই তেলে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ, আদা ও লঙ্কাবাটা ছেড়ে দিন। একটা পাত্রে ১ কাপ দই, পরিমাণ মতো নুন ও চিনি এবং আধ চা-চামচ হলুদ একসঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন। কড়াইতে মশলা একটু কষে গেলেই ফেটানো দইটা দিয়ে আরও একটু কষুন। মশলা থেকে তেল বেরিয়ে এলে প্রয়োজন অনুযায়ী নুন, মিষ্টি ও একটু জল দিয়ে ভাজা মাছগুলো ছেড়ে দিন। ফুটে উঠলে নামিয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

স্বা গ তা ল ক্ষ্মী

অষ্টমীর ভোগ খিচুড়ি হিংলাজ

কী কী লাগবে

গোবিন্দভোগ চাল ৫০০ গ্রাম, মুগ ডাল ৫০০ গ্রাম, কুমড়ো ও ক্যাপসিকাম ডুমো করে কাটা, ঘি, শুকনোলঙ্কা ২টি, সাদা জিরে, সামান্য হিং, আস্ত গোলমরিচ, আন্দাজমতো নুন ও হলুদ, এগলেস বা ডিমছাড়া মেয়োনিজ ২টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মুগডাল শুকনো খোলায় সোনালি করে ভেজে নিন। কড়াইতে ঘি গরম হলে একে একে শুকনোলঙ্কা, সাদা জিরে ও সামান্য হিং ফোড়ন দিন। ফোড়নের মধ্যে ভাজা মুগডাল দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন। তেলে একে একে ডুমো করে কাটা কুমড়ো, ক্যাপসিকাম ও আস্ত গোলমরিচ দিন। ধুয়ে রাখা গোবিন্দভোগ চালটা দিয়ে দিন। একটু নেড়েচেড়ে আন্দাজমতো নুন, হলুদ ও ডিম ছাড়া মেয়োনিজ ভাল করে মিশিয়ে জল

ঢেলে দিন। চাল, ডাল সেদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ই ন্দ্রা ণী সে ন

নবমীর আমিষ মেথি চিকেন

কী কী লাগবে

১ কেজি মুরগির মাংস, ২০০ গ্রাম টক দই, ১২-১৪ কোয়া রসুনবাটা, সামান্য মেথি, নুন, হলুদ, কাঁচালঙ্কা ৪টি, সাদা তেল।

কী করে করবেন

মুরগির মাংস ধুয়ে টক দই দিয়ে মেখে রাখুন। কড়াইতে সাদা তেল গরম হলে গোটা মেথি ফোড়ন দিয়ে রসুনবাটা দিন। রসুন একটু বাদামি হয়ে এলে দই মাখানো মাংসটা কড়াইতে ঢেলে দিন। চিরে রাখা কাঁচালঙ্কা, আন্দাজমতো নুন ও সামান্য হলুদ দিয়ে ভাল করে কষুন। মাংস থেকে তেল বেরিয়ে এলে নামিয়ে ভাত বা রুটি-পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

প র মা

বিজয়ার মিষ্টি ক্ষীরের রসে ডোবানো মালপোয়া

কী কী লাগবে

খোয়া ক্ষীর (গ্রেট করা), দুধ ১ লিটার, আধ কাপ ময়দা, আধ কাপ সুজি, আধ চা চামচ বেকিং পাউডার বা বেকিং সোডা, গুঁড়ো করা চিনি (পরিমাণ মতো), এক চিমটে নুন, এক চিমটে বড় এলাচ গুঁড়ো, সামান্য মৌরি, সাদা তেল, ঘি (২চামচ), জাফরান (সামান্য)।

কী করে করবেন

দু'টি ভাগে রান্নাটা করতে হবে। প্রথমভাগে ক্ষীরের রস বানানোর জন্য একটি কড়াইতে ঢিমে আঁচে অল্প পরিমাণ গ্রেট করা ক্ষোয়া ক্ষীর, পরিমাণ মতো গুঁড়ো চিনি দিয়ে অল্প অল্প করে দুধ মেশান। লক্ষ্য রাখুন ক্ষীর, দুধ ও চিনির এই মিশ্রণটি যেন পাতলা হয়। ক্ষীর মোটামুটি তৈরি হয়ে এলে তাতে একটু জাফরান দিন। তবে সুন্দর গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরে একটা রঙ-ও আসে। দ্বিতীয় ভাগে বাকি গ্রেট করা খোয়া ক্ষীর ও দুধ এক সঙ্গে কোনও একটি পাত্রে মিশিয়ে ১কাপ ঘন ক্ষীর তৈরি করে ঠাণ্ডা করে নিন। এবার ঘন ক্ষীর, আধ কাপ ময়দা, আধ কাপ সুজি, আধ চা চামচ বেকিং পাউডার, পরিমাণ মতো চিনির গুঁড়ো, এক চিমটে নুন, সামান্য এলাচ গুঁড়ো ও গোটা মৌরি দিয়ে একটি থকথকে মিশ্রণ বা ব্যাটার তৈরি করুন। কড়াইতে ডিপ ফ্রাই হওয়ার মতো সাদা তেল এবং দু চামচ ঘি একসঙ্গে গরম করুন। হাতা দিয়ে মিশ্রণটি খুব আলতো করে তেলের উপর চ্যাপ্টা করে ছাড়ুন। ডোবা তেলে, ঢিমে আঁচে ধীরে ধীরে লাল করে মালপোয়াগুলো ভেজে তুলুন।

তারপর গরম গরম ভাজা মালপোয়াগুলো আগে বানিয়ে রাখা ক্ষীরের রসে ডুবিয়ে পরিবেশন করুন।

কথা ও কাহিনি

ছেঁড়া শেকড়

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

চল্লিশ মিনিট হতে চলল সোমনাথদার দেখা নেই। কথা মতো মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিভাস। সোমনাথদা বলেছিল, কাঁটায় কাঁটায় দশটায় চলে আসবি। ফাস্ট আওয়ারেই ধরতে হবে রায়চৌধুরীকে। এবার মনে হচ্ছে তোর একটা হিল্লে হবেই।

'হিল্লে' মানে চাকরি। সে তো দূর অস্ত, যে যোগাযোগ করিয়ে দেবে, তারই পাত্তা নেই। যদিও বিভাসের এখন যা অবস্থা একটা ছোটখাটো কাজের জন্য ঘন্টার পর ঘণ্টা যে কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি। কিন্তু আজ আর ভাল লাগছে না। নিজেকে কেমন যেন অর্ধনগ্ন ভিখিরি মনে হচ্ছে। কথাটা মোটেই উপমা নয়, ঘোরতর বাস্তব। মা মারা গেছে চারদিন হল। বিভাসের পরনে অশৌচের ধরা। গলায় সাদা সরু কাপড়ের মালায় লোহার চাবি বাঁধা। কম্বলের আসন গোঁজা কোমরে। পায়ে হাওয়াই চটি। রীতি অনুযায়ী খালি পায়ে থাকার কথা, এখন আর অতটা কেউ মানে না তবে একটা অনিয়ম করেছে বিভাস, ধুতির তলায় সাদা ড্রয়ার পরেছে। এটা না পরলে হুগলি থেকে হাওড়া স্টেশনে আসার সাহস পেত না। যা ভিড় হয় ট্রেনে!

সোমনাথদা বিভাসের পিসির ছেলে। কিছু মানুষ থাকে না, কারও জন্য কিছু করতে পারলে বড্ড খুশি হয়, সোমনাথদা তাদেরই একজন। এল. আই. সি-র এজেন্ট। ব্যবসা ভালই করে মনে হয়। সর্বদাই ব্যস্ত। সেন্ট্রাল কলকাতায় বসবাসের কারণে বড় বড় পার্টির পলিসি ওর ফোলিও ব্যাগে। বিভিন্ন অফিস কাছারিতে যাতায়াত আছে। বিভাসের জন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে সে। দু'চার জায়গায় নিয়েও গিয়েছিল। কাজগুলো সোমনাথদারই পছন্দ হয়নি। হয় স্যালারি কম নতুবা কাজটা ভদ্রস্থ নয়। বিভাস গ্র্যাজুয়েট। একটা মানানসই চাকরি করে দিতে সোমনাথদা বদ্ধ পরিকর।

এদিকে মা মারা যেতে বিভাস আরও গরিব হয়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পর আধখানা পেনশন, যা দিয়ে চলছিল সংসার, তাও এবার বন্ধ। সম্বল বলতে বিভাসের টিউশানি। নিজের বাড়িতেই পড়ায় গোটা দশেক ছেলেমেয়েকে। গ্রামের দিকে ছাত্রর বাড়ি গিয়ে পড়ানোর চল কম। চাষীবাসি লোক, আলাদা করে টিচিং দেওয়ার মতো খরচা করে উঠতে পারে না, গ্রুপে পড়িয়েও সবার থেকে নিয়মিত ফিজ পায় না বিভাস। ধার বাকি পড়ে। ঘরের লাউ, কুমড়ো, পুকুরের মাছটাছ পাঠিয়ে কমপেনসেট করে অনেকে।

মায়ের শ্মশান যাত্রায়, হাঁটতে হাঁটতে এইসব দুঃখের কথাই সোমনাথদাকে বলেছিল বিভাস। বেদনাহত চিন্তিত মুখে সোমনাথদা কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। দূরে থাকা আত্মীয় বলতে একমাত্র সেই এসেছে মায়ের শেষ যাত্রায়। বেচারা বহুদিন ধরে বিভাসের জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। ওর মতো জীবনবীমার এজেন্ট হয়ে যেতে বলেছিল। বিভাস বলেছে, গ্রামের লোক মহাজনের থেকে ধার নিয়ে চাষাবাদ করে। এরা করবে পলিসি। এক দু'জন এজেন্ট অলরেডি এখানে আছে। মুখ শুকিয়ে ঘোরে। লোকে ওদের দেখলেই রাস্তা পাল্টায়।

শ্মশান ফেরত সোমনাথদা বলল, নাঃ, এবার যে করে হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। অন্য স্টেটে যেতে হলে, যাবি তো? এখন তো মামি নেই। তাকে দেখা শোনার ব্যপার থাকল না।

অনিচ্ছে সত্ত্বেও সম্মতি জানিয়ে ছিল বিভাস। মা না থাকলেও, ভিটেটুকু আছে। মায়ের হাতে লাগানো গাছপালা, বাবার ইজিচেয়ার। তিলতিল করে পয়সা জমিয়ে পাকা বাথরুম পায়খানা। বাড়ির ছাদ পাকা করা যায়নি, টালির রয়ে গেছে। মা-বাবা জগতে নেই, একমাত্র বোনের বিয়ে হয়েছে, দূরে, আগ্রায়। ছুটি পায় না। ভিটেটাকেও ছেড়ে গেলে এ পৃথিবীতে বড় একা হয়ে যাবে বিভাস...

চিন্তার মাঝে কাঁধে একটা চাপড় পড়ল। ঘুরে দেখে, সোমনাথদা। বলল সরি, অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম। কী করব বল, বেরোতে যাচ্ছি, ক্লায়েন্ট এসে হাজির। পলিসির এগেনস্টে লোন চাই... হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে অভিযোগের সুরে সোমনাথদা বলল, তোকে কবে থেকে একটা মোবাইল নিতে বলছি, দেরি কেন হচ্ছে জানিয়ে দিতে পারতাম। খামোকা টেনশনে থাকতে হত না।

—না না, কী এমন দেরি। বলে ম্যানেজ দেয় বিভাস। মোবাইল ফোন মানেই আরেকটা খরচ ঘাড়ে নেওয়া। তার এখনকার জীবন-যাপনে ফোনের বড় একটা প্রয়োজনও পড়ে না।

দু'জনে এস এন ব্যানার্জি রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। হকার পথচারী মিলিয়ে থিক থিক করছে ফুটপাত। তাদের ডজ, ড্রিবলিং করতে করতে বিভাস বলে, আমি ভাবছি তোমার রায়চৌধুরী না আবার বেরিয়ে যায়।

—বেরোবে না। ফোন করেছিলাম বলল, আপাতত ঘণ্টা দুয়েক থাকবে। বলে নিয়ে সোমনাথদা জানতে চাইল, কিছু খাবি তো? সেই তো কখন খেয়ে বেরিয়েছিস!

—খিদে সেরকম পায়নি। চলো আগে দেখা করে নিই। বলল বিভাস। সোমনাথদার মুখে শুনেছে রায়চৌধুরীর অফিস ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। অনেকটাই হাঁটতে হবে। খিদে তার সত্যিই পেয়েছে। আশপাশে-র বাড়ি থেকে দেওয়া একগাদা ফলমিষ্টি ঘরে ছিল। ঘুম থেকে উঠেই ওসব খাওয়া যায় না। বাথরুমের কাজ সেরে কলকাতার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিল। স্টেশন লাগোয়া হাবুদার দোকানে বসে খাচ্ছিল সকালের প্রথম চা, বিস্কুট। কোথা থেকে

সামনে এসে দাঁড়াল বেড়াল পাগলি। কোলে সর্বক্ষণ একটা বেড়াল নিয়ে ঘোরে। হাতের বাটি বাড়িয়ে ধরল হাবুদার দিকে। চা দিতে হবে। চা হাবুদা দেয়, বিস্কুট দিতে হয় খদ্দেরদের। এরকমই একটা অলিখিত চুক্তি করে নিয়েছে পাগলি। নিজের দু'টো বিস্কুট থেকে একটা পাগলিকে দিয়েছিল বিভাস। পাগলি নিজে এবং পোষ্যকে চা, বিস্কুট খাওয়াতে থাকল। বিভাস উঠে গিয়েছিল প্লাটফর্মে। বসে থাকলে পাগলি আরও বিস্কুট চাইত। খিদের থেকেও বিভাসের কাছে এখন চাকরিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। টেনশান হচ্ছে, রায়চৌধুরী না চলে যান। মায়ের অন্তেষ্টির দু'দিন পর পাশের বাড়িতে ফোন করেছিল সোমনাথদা। সামন্তরা ডেকে দিতে বিরক্ত হয় না। ওদেরও বাজার দোকান প্রয়োজনমতো করে দেয় বিভাস। সোমনাথদা ফোনে বলে, পরশু চলে আয়। চাকরির একটা খবর হয়েছে।

বিভাস বলেছিল, এই ড্রেসে কী করে যাব! মায়ের কাজটা মিটুক, তারপর...

—ধুর, বোকা। ওই ড্রেসটাই তো অ্যাডভান্টেজ। চাকরি নাইনটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে ধরে নে। বাকি টেন কনফার্ম করবে ওই পোশাক। বলে একটু থেমেছিল সোমনাথদা। অনুতপ্ত গলায় ফের বলেছিল, কিছু মনে করলি না তো?

—না না, মনে করার কী আছে! বলেছিল বিভাস। একই সঙ্গে অনুভব করেছিল, মার যাওয়ার পরও মায়ের অবদান, শোক পরিধান হয়ে বিভাসকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এবারের চাকরিটার ক্ষেত্রে সোমনাথদা এতটা সিওর হচ্ছে কেন, কে জানে! ফোনে যতটুকু বলেছে, বড় একটা ওষুধ কম্পানির ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটার রায়চৌধুরী বাবু। ওঁর কম্পানির নাম আর. এস. এন্টারপ্রাইস। মুম্বইয়ে একটা ব্রাঞ্চ আছে। ভদ্রলোক পালা করে কলকাতা মুম্বইয়ে থাকেন। বিভাসের চিন্তা হচ্ছে, লোকটা তাকে মুম্বইয়ে না ঠেলে দেয়। দিলে অবশ্য কিছু করার নেই, যেতে হবে। এরকমই হয়তো কপালে লেখা আছে।

সোমনাথদা এ গলি সে গলি ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, বিভাস অনুসরণ করে চলেছে মাত্র। ধর্মতলার অলিগলি সে বিশেষ চেনে না।

সোমনাথদার উদ্দেশে গলা তুলে বলে, তুমি

কী ভাবে আঁচ করছ চাকরিটা হয়ে যাবে? বলছ, নাইনটি পার্সেন্ট চান্স, ওদের কি এক্ষুনি কোনও লোকের দরকার?

—ঠিক এক্ষুনিই কি না জানি না। তোদের ওখান থেকে ফেরার পর ওঁরই একটা দরকারে দেখা করেছিলাম। রায়চৌধুরী আমার বিগ ক্লায়েন্ট। কথার ফাঁকে তুলেছিলাম তোর প্রসঙ্গ। প্রথমে বলল, কলকাতার অফিস ছোট। বারো জনে দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে। সব স্টাফই যথেষ্ট এফিশিয়েন্ট। বাধ্য হয়ে মুম্বই ব্রাঞ্চের কথা তুললাম। বলল, ওখানে কি বেকার ছেলে কম?— ধরে নিলাম হবেই না। এখন সিমপ্যাথি আদায়ের রাস্তা নিতে হল। বললাম, মামি রিসেন্ট মারা গেল মামাতো ভাইটা হুগলির বাড়িতে একা পড়ে গেছে। রোজগারপাতি প্রায় নেই বললেই চলে। দু'চারটে টিউশন পড়ায়। তখন জানতে চাইল, হুগলির কোথায় থাকে? বললাম, কানাগড়। শুনে বলল, তোমার সঙ্গে ছেলেটার নিয়মিত যোগাযোগ আছে তো? স্বভাব চরিত্র ভাল করে জানো?— খুব করে গুনগান করে দিলাম তোর। অবশেষে রাজি হল। বলল, অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল ভাইকে নিয়ে এস। দেখি কথা বলে।

নিউমার্কেট চেনে বিভাস। সামনে দিয়ে যেতে যেতে ভাবে, তার সম্বন্ধে যা যা বলেছে সোমনাথদা, এর মধ্যে কোন পয়েন্টটা রায়চৌধুরীকে আগ্রহী করে তুলল, মা মারা যাওয়া, গরিব হয়ে যাওয়া, গ্রামে থাকা, নাকি ক্যান্ডিডেট সৎ এবং সোমনাথদার ভাই? কোনওটাই তেমন জোরালো মনে হচ্ছে না।

অফিসটা ছোট হলেও, বেশ পরিপাটি। সেন্ট্রাল এসি। রিসেপশনে তন্বী। প্লাইউডের খোপে কাজ করছে স্টাফেরা। একমাত্র চেম্বার রায়চৌধুরীর। পুশডোর ঠেলে ঢুকল সোমনাথদা, পিছনে বিভাস।

কমপিউটার থেকে চোখ ফেরালেন বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের রমেশ রায়চৌধুরী। বেশ বনেদি, অভিজাত চেহারা। সোমনাথদা বলল, স্যার, এর কথাই বলেছিলাম। আমার মামার ছেলে।

বিভাসের পোশাকের কারণেই সম্ভবত রায়চৌধুরী সাহেবের মুখে অপ্রতিভ ভাব। বললেন, বসো, প্লিজ বি সিটেড।

গদগদ ভঙ্গিতে সোমনাথদা টেবিলের এপারের চেয়ারে গিয়ে বসে। ডেকে নেয় বিভাসকে। রায়চৌধুরী বললেন, তুমি ওকে এই অবস্থায় নিয়ে এলে কেন! শ্রাদ্ধের কাজ সেরে আসতে পারত।

—না, মানে, আমার মনে হল আপনার বোধহয় আর্জেন্ট দরকার আছে... কথা শেষ করল না সোমনাথদা। রায়চৌধুরী অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কী যেন চিন্তা করছেন। বিভাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে জানতে চান, তুমি তো গ্র্যাজুয়েট। সাবজেক্ট কী ছিল?

—কমার্স, স্যার। বলল বিভাস।

—গুড। তার মানে অ্যাকাউন্টসের কাজ পারবে।

—পারব স্যার। প্রথমে একটু অসুবিধে, মানে দেখিয়ে দিলে...

কথা কেটে রায়চৌধুরী জানতে চান, স্যালারি কত এক্সপেক্ট করছ?

উত্তর দেয় সোমনাথদা। বলে, ও কী বলবে স্যার! আপনি যা ভাল বুঝবেন দেবেন।

বিভাস বুঝতে পারে চাকরিটা প্রায় হয়ে যাচ্ছে। এত সহজে! স্বপ্ন দেখছে না তো? রমেশ রায়চৌধুরী বলতে থাকেন, বছরের অনেকটা সময় আমি মুম্বইয়ে থাকি। কম্পানিকে নিজের মনে করে কাজ করতে হবে। এখানে সবাই তাই করে।

বাধ্য স্কুল ছাত্রের মতো ঘাড় হেলায় বিভাস। রায়চৌধুরী ফের বলেন, আপাতত চার হাজার নিয়ে শুরু করো। কাজ স্যাটিসফ্যাকট্রি লাগলে বাড়বে। ঠিক আছে?

এবার ঘাড় হেলাতে ভুলে যায় বিভাস। তথাকথিত মালিক সম্বন্ধে তার ধারনাই পাল্টে যাচ্ছে। এত ভদ্র প্রাইভেট কম্পানির ওনার এখনও হয়! সকালে আজ কার মুখ দেখে উঠেছে বিভাস? দ্রুত ভাবতে থাকে। একটু নার্ভাস হয়ে আছে বলে হয়তো মনে পড়তে চাইছে না। বিছানা থেকে উঠে দালানে এসেছিল, দিনের প্রথম কাক দেখে। ওটাকে রোজ বাসি রুটি দিত মা। কাকের পর সকালে আর কারও মুখোমুখি হয়নি। চাকরিটার চিন্তায় মগ্ন ছিল। চান-টান করে সোজা হাবুদার চায়ের দোকান। হাবুদার দিকে না তাকিয়েই চা-বিস্কুটের অর্ডার দেয়।

—হুগলির কোথায় যেন থাকো? প্রশ্ন রায়চৌধুরীবাবুর।

বিভাস বলল, কানাগড়ে। একটু গ্রাম সাইডে।

—হুগলির আগের স্টেশন তো চুঁচড়ো। বেশ বড় শহর।

—হ্যাঁ স্যার, হাসপাতাল, কোর্ট, জেলা সদর অফিস সব আছে।

—যাওয়া হয় ওদিকে?

—যাই স্যার। শহরের দিকে দরকার তো পড়েই।

—পিপুলপাতি নামে একটা জায়গা আছে না?

—আছে স্যার, হুগলি স্টেশন থেকে কাছে হয়। আপনি কি ওদিকে কখনও গিয়েছিলেন? কথাগুলো, প্রশ্নটা সোমনাথদার।

পাশ কাটিয়ে গেলেন রায়চৌধুরী। বিভাসকে জিজ্ঞেস করলেন, পিপুলপাতি কিন্তু হিস্টোরিকাল প্লেস। কেন জানো?

এটা কি ইনফরমাল ইন্টারভিউ? ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বিভাস। বিমর্ষ মুখে বলে, না স্যার, জানি না।

—বাংলা ব্যাকরণের প্রথম বই হ্যালহেড সাহেবের 'A Grammar of the Bengali Language' যা লেখা হয় শ্রীরামপুরে, পিপুলপাতির ছাপাখানায় প্রথম ছাপা হয়। জন অ্যান্ড্রুস-এর প্রেস ছিল সেটা।

উৎসাহিত হয়ে ওঠে সোমনাথদা। বলে, আপনি কী করে এতসব জানলেন স্যার?

—যেভাবে সবাই জানে। বই পড়ে। বলে হাসলেন রায়চৌধুরী। বিভাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, যেখানে জন্ম থেকে বসবাস করছ, ইতিহাসটা জেনে রাখা উচিত। তাই না?

নিরীহ ভঙ্গিতে সায় দেয় বিভাস। চাকরিটা কি কেঁচে গেল? বিভাস কিন্তু শিওর, ওদের এলাকার এইট্টি পার্সেন্ট লোক এই তথ্যটা জানে না। তারা দিব্যি কলকাতায় এসে চাকরি বাকরি করে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে। মায়ের কাজটাজ মিটিয়ে জয়েন করে যাও। আসার দিন আমাকে একটা ফোন করে নেবে, কেমন।

কথাটা এমন সুরে শেষ করলেন রায়চৌধুরী, ওর মধ্যেই বলা হয়ে গেল, এবার এসো।

সোমনাথদার সঙ্গে বিভাসও উঠে পড়ে। গোটা বিষয়টাই অবিশ্বাস্য লাগছে, এই বাজারে অবলীলায় চাকরি হয়! তাহলে এতদিন হচ্ছিল না কেন? কোনও শুভ প্রভাব কাজ করছে কি? মনে পড়ে গেল বেড়াল পাগলির কথা। ঠিকঠাক বলতে গেলে, ওর মুখটাই আজ স্পষ্ট করে দিনের প্রথমে দেখেছে বিভাস। পাগলিটা তার মানে পয়া বলেই মনে হচ্ছে। পরের দেখায় ওকে বেশ ক'টা বিস্কুট খাওয়াবে বিভাস। কিপটেমি করবে না।

দুই

পরলৌকিক কাজকর্ম সেরে নেড়া মাথায় অফিস জয়েন করল বিভাস। স্যার চিনতে একটু সময় নিলেন। অচিরেই তাঁর চোখে মুখে ওয়েলকাম এক্সপ্রেশান ফুটে উঠল। নিয়ে গেলেন

রক্ষিতবাবুর কাছে। ভদ্রলোক কম্পানির অ্যাকাউন্টস দেখেন। বস রক্ষিতবাবুর সঙ্গে বিভাসের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, আজ থেকে এ আপনাকে অ্যাসিস্ট করবে। কিছু জানতে চাইলে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

রক্ষিতবাবু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন বস-এর দিকে। চোখে বেশ কিছু প্রশ্ন। সে সব অগ্রাহ্য করে রায়চৌধুরী ফিরে গেলেন চেম্বারে।

রক্ষিতবাবুর প্রশ্নগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভাসকে শুনতে হল। বিহ্বলভাব কাটিয়ে রক্ষিতবাবু প্রথমে বিভাসের বায়োডাটা, বাড়ির আর্থিক অবস্থা জেনে নিলেন। তারপর বললেন, কী ব্যাপার বলো তো, তোমাকে হঠাৎ আমার পেছনে জুতে দিল কেন? আমাকে কি এবার তাড়াবে?

কী বলবে ভেবে পায় না বিভাস। রক্ষিতবাবু অবশ্য উত্তরের আশায় বসে নেই। বলতে থাকেন, কী এমন আহামরি কাজ এই ডিপার্টমেন্টে! হাফবেলায় শেষ হয়ে যায় আমার। তারপর ব্যাঙ্ক, সেলসট্যাক্স অফিসে ঘোরাঘুরি করি। কোনও কোনও দিন সে সব কাজও থাকে না। ঢুলি চেয়ারে বসে।

বিভাসের মাথায় ঘুরতে থাকে মুম্বই। এখানে কাজ শিখিয়ে পাঠিয়ে দেবে মনে হচ্ছে। সম্ভাবনার কথাটা মুখে আনে না বিভাস। আজই অফিস বেরোনর সময় নিজের হতশ্রী বাড়িটার দিকে চেয়ে ভেবেছিল, মাইনের টাকা থেকে টুকটাক সারাইয়ে হাত দেবে। বাগানে বাঁশের বেড়া দেবে নতুন করে। ঘরে ভেতরে কলি ফেরাবে। বোন-জামাইকে ফোন করে বলবে ছুটি নিয়ে ক'দিন এখানে এসে থেকে যেতে। বোন তো প্রায় ভুলতেই বসেছে তার ছোটবেলার পাড়া। বাড়ির এই হালের জন্য মা জামাইষষ্ঠীতে ওদের ডাকতে লজ্জা পেত।

রক্ষিতবাবু কাজ কিছুই দেখালেন না। নিজের টিফিন ভাগ করে খাওয়ালেন। অফিসের বাইরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দোকান থেকে চা খেল দু'জনে। সেই অবসরে রক্ষিতবাবু নিজের আর্থিক পরিস্থিতির কথা জানালেন। খুবই টানাটানির সংসার। সাড়ে চার হাজারে চলে না।—ফের একটা ঝাঁকুনি খেল বিভাস। তার স্যালারি চার ফিক্সড হয়েছে। পাঁচশো টাকা বাঁচাতে একটা কাজ জানা লোককে তাড়িয়ে দেবে কম্পানি! এটা হতে পারে না। তাহলে কি রক্ষিতবাবু বড় কোনও গড়মিল করছেন কাজে?

তিন

পরের দিন একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে অফিসে ঢুকল বিভাস। রক্ষিতবাবুর কাছে পৌঁছতেই, উনি বললেন, কর্তা ডেকেছেন।

অজানা আশঙ্কায় বস-এর চেম্বারের উদ্দেশে পা বাড়ায় বিভাস। কে জানে, কেন ডাকছেন! কাল কোনও কাজই করা হয়ে ওঠেনি। বসে বসে বোর হচ্ছিল। ছুটির একঘণ্টা আগে রক্ষিতবাবু ঠেলে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

দরজা ঠেলে ঢুকল বিভাস। রায়চৌধুরী আগের মতোই হাসিখুশি মুখে অভ্যর্থনা জানালেন। এসো, বসো।

মুখোমুখি চেয়ারে বসল বিভাস। রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন, কেমন লাগছে কাজ?

বিভাস লম্বা কথায় যেতে চায় না। আগে বুঝতে হবে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য। বলে, ভাল।

বস জানতে চাইলেন, তোমার ওখান থেকে অফিস আসতে টাইম কত লাগছে?

—প্রায় দু'ঘণ্টা মতো স্যার।

এতটা দূরত্ব বিভাসের পক্ষে সমস্যার, বুঝতে পেরে ঠোঁট ওলটালেন রায়চৌধুরী। বললেন, পাড়ায় ফিরে তার মানে আর আড্ডা মারার সময় পাচ্ছো না।

প্রসঙ্গটা রায়চৌধুরী কেন তুলেছেন, আন্দাজ করতে পারছে না বিভাস। কিছু তো বলতেই হয়। তাই বলে, আমি আড্ডা তেমন মারি না। কয়েকটা টিউশান পড়াতাম, এবার ভাবছি ছেড়ে দেব।

—সে কী, ইয়াং ছেলে আড্ডা মারো না! বিস্ময় প্রকাশ করলেন রায়চৌধুরী। তারপর বললেন, তোমার বয়সে আমি কত আড্ডা মেরেছি। চুঁচড়োয় ঘড়ি মোড়ের কাছে আমাদের ঠেক বিখ্যাত ছিল।

তথ্যটা অপ্রত্যাশিত। অবাক গলায় বিভাস বলে, আপনি চুঁচড়োয় থাকতেন? আমাদের এলাকার পাশেই!

—ইয়েস। চুঁচড়োয় আমার ঠাকুর্দার বাড়ি। আমার জন্মও ওখানে। লেখাপড়া ওখানকার স্কুল-কলেজে।

এম. বি. এ. করেছি কলকাতায়।

এই সন্দেহটা সোমনাথদা প্রশ্নের আকারে রেখেছিল, যেদিন বিভাসকে নিয়ে প্রথম এসেছিল এই অফিসে। উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলেন রায়চৌধুরী। আজ বিভাসের সামনে কোনও দ্বিধা করলেন না। কেন? বিভাস জিজ্ঞেস করে, চুঁচড়োর বাড়িটা কি এখনও আছে?

—আছে। তালা দেওয়া। রিলেটিভসরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। আমারও আর যাওয়া হয় না। অথচ একসময় কী অ্যাটাচমেন্ট ছিল ওখানকার সঙ্গে। বলে একটু যেন উদাস হয়ে গেলেন রায়চৌধুরী। ফের অতীতচারীর গলায় বলতে থাকলেন, বন্ধুরা মিলে সাইকেলে চষে বেরিয়েছি আসপাশের সমস্ত এলাকা। তোমাদের কানাগড়ে একটা অন্নপূর্ণা মন্দির আছে না? লোকে বলে খুব জাগ্রত ঠাকুর।

বুকে বেশ একটা বল ভরসা এসে গেছে বিভাসের। বস যখন তার এলাকার লোক, চাকরিটা থাকবে মনে হচ্ছে। বিভাস বলে, মন্দিরটার নতুন করে সংস্কার হচ্ছে এখন।

—ও, তাই নাকি। আচ্ছা, ওই মন্দির চাতালে একটা পাগলি শোয় না?

প্রচণ্ড হোঁচট খায় বিভাস। এই খবরটা তো জানার কথা নয় স্যারের! পাগলিটা বছর চারেক হল এসেছে এলাকায়। বস তখন ইয়াং এজ বেরিয়ে গেছেন। প্রথম দিকে পাগলি মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। লোকে বলত, পুলিশের চর। আশপাশে কোনও বড় অপরাধ চক্র লুকিয়ে আছে নির্ঘাত। আর একটা গল্পও চালু হল, বউটার স্বামী বেড়ালের কামড়ে মরেছে। তাই কোলে বেড়াল নিয়ে ঘোরে। মাথা খারাপ হয়ে গেলে যা হয় আর কি। অনেকদিন পর্যন্ত পাগলির দিকে তাকালে গা ছমছম করত বিভাসের। ক্রমশ গ্রামের ধুলো কাদায় মিশে পাগলি সমস্ত রহস্য হারিয়ে ফেলল। এখন দিব্যি মানিয়ে গেছে। যে কোনও জনবসতিতে রাস্তায় ঘোরা একটা পাগল অথবা পাগলি তো থাকেই। বিভাস বলে, স্যার, পাগলিটা আমাদের এলাকায় বছর কয়েক হল এসেছে। তখন কি আপনারা আড্ডা মারতেন?

—না মারতাম না। আড্ডা ছেড়েছি বছর পনেরো হয়ে গেল।

একটু থামলেন রায়চৌধুরী। বিভাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, ওই পাগলি আমার নিজের পিসি।

ধপ করে অফিসটা যেন ভীষণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এ সি মেশিনের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক বিরতি-র পর রায়চৌধুরী বলতে থাকেন, বেশ কয়েকবার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাড়ি ফিরেছে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে। বাড়ি বলতে চুঁচড়োর কথা বলছি। পিসিকে দেখার মতো নিজের লোক কেউ নেই ও বাড়িতে। কাজের লোকের চোখে ফাঁকি দিয়ে পিসি কিছুদিন পরই বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। এরকমই ঘটে চলেছিল প্রতিবার।

চুপ করে গেলেন রায়চৌধুরী। চোখে অনির্দিষ্ট চাউনি। বিভাস নিজের এক্সপ্রেশান কেমন রাখবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। চুলে জট লাগা, নোংরা শাড়ি কাঁথা জড়ানো পাগলিটা যে স্যারের পিসি, বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই।

রায়চৌধুরী চেয়ারের বাঁপাশ থেকে একটা প্লাস্টিকে-র ক্যারিব্যাগ তুললেন। কাপড়ের দোকানের নাম ছাপা। বিভাসের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এতে শাড়ি আছে। পিসিকে দিয়ো। জানি, পরবে না। তবু মুড বুঝে দিয়ে রেখো।

বিভাসের দৃষ্টি হোঁচট খায় সামনের দৃশ্যে। এ কী দেখছে সে! ফিট দশেক দূর দিয়ে আড়াআড়ি রাস্তা পার হচ্ছে বেড়াল পাগলি। স্যারের দেওয়া শাড়িটা এখন আরও ছেঁড়াখোঁড়া। কোলে বেড়ালটাও আছে। যেতে যেতে এক ঝলক দেখল বিভাসদের।

বিভাস ক্যারিব্যাগটা নিজের কাছে নেয়। পার্স খুলে বেশ ক'টা একশোর নোট বার করলেন রায়চৌধুরী। বিভাসকে টাকাগুলো দিয়ে বললেন, একটু লক্ষ রেখো পিসিকে। ভাল কিছু খেতে দিয়ো। যদি খাওয়াতে পারো, আরও দেবো।

সহজে চাকরি পাওয়ার রহস্য বিভাসের কাছে আজ একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল।

চার

বস-এর পিসিকে মিষ্টি, চপটপ খাওয়ানো গেলেও, শাড়িটা পরানো গেল না। ইতিমধ্যে পাঁচদিন কেটে গেছে। রোজ অফিসে এসেছে বিভাস। রক্ষিতবাবু বোধহয় কোনওভাবে বুঝতে পেরেছেন, তার চাকরিটা আপাতত যাচ্ছে না। বিভাসকে কাজকর্ম দেখাচ্ছেন। একই টেবিলে কাজ করছে দু'জনে। বিভাস আছে টেনশনে, এই বুঝি স্যার ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, শাড়িটা পিসি পরল কি না? পরেনি শুনলে হয়তো বিভাসের চাকরিটাই নট হয়ে যাবে।

গত ক'দিন যখনই পাগলিকে একলা পেয়েছে বিভাস, দিতে গেছে শাড়ি। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে সে। বিভাস পাগলিকে ডেকে ডেকে খাবার দিচ্ছে দেখে, এলাকার মানুষের কপালে ভাঁজ পড়ছে। চায়ের দোকানের হাবুদা তো সেদিন বলেই বসল, কী ব্যাপার রে, চাকরিতে খুব উপরি কামাচ্ছিস মনে হচ্ছে! পাগলি খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছিস!—এ কথা শোনার পর শাড়িটা সবার সামনে দিতে চায়নি বিভাস। একলা পেয়েও যখন দেওয়া গেল না, কাল রাতে মন্দিরের দালানে ঘুমন্ত পাগলির গায়ে চাপা দিয়ে এসেছিল। আজ সকালে অফিস আসার সময় দেখে, সেই শাড়ি ফালা ফালা করে পাগলীর গায়ে জড়ানো, সাদাটে শাড়ির আড়ালে কোলের বেড়ালটাকে আজ প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল বিভাসের। মা যদি পেত শাড়িটা, খুশি হত খুব। পুজোর সময় আত্মীয়দের দয়া-দাক্ষিণ্যে একটা দু'টো অতি সাধারণ শাড়ি পেত মা। পরে দাঁড়াত বিভাসের সামনে। কিশোরীর মতো হেসে বলত, দ্যাখ তো কেমন লাগছে?... ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিল বিভাস, টেবিলে ইন্টারকম বাজল। রক্ষিতবাবু তুললেন, ওপারের কথা শুনে নিয়ে বিভাসকে বললেন, সাহেব ডাকছেন তোমাকে। চেম্বারে যাও।

রিপোর্ট চাইবেন বস। বিভাস স্যারের ঘরের দিকে ধীরগতিতেই যায়। এখনও যে ঠিক করে উঠতে পারেনি, সত্যি বলবে, না মিথ্যে? সত্যি বললে স্যার চটে যাবেন খুব।

চেম্বারে ঢুকতেই বস চমকে দিলেন। ভ্রূ নাচিয়ে বললেন, কী, পরেনি তো শাড়ি?

মিথ্যে বলার প্রস্তুতি নিতে পারল না বিভাস, দুঃখি মুখ করে মাথা নাড়ল। আরও বড় চমক অপেক্ষা করছিল তার জন্য। স্যার বললেন, শাড়ি ছিঁড়ে খুঁড়ে গায়ে জড়িয়ে ঘুরছে নিশ্চয়ই?

বস কি অন্তর্যামী! ভ্যাবলার মতো স্যারের দিকে চেয়ে থাকে বিভাস। বস বললেন, আরে, এসো। বসো চেয়ারে। এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন! আজ তোমাকে আরও একটা কঠিন কাজ দেব।

বিভাস চেয়ারে বসে। এবার কোনও ক্যারিব্যাগ ট্যাগ নয়। এক তাড়া নোট এগিয়ে ধরলেন স্যার। বললেন, এতে দশ হাজার আছে। পিসিকে যেন তেন প্রকারে এলাকার বাইরে পাঠাতে হবে। আর যেন ফিরে না আসে তোমাদের ওখানে।

অজান্তেই বিভাসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, কেন স্যার?

—হুগলি, চুঁচড়ো এলাকায় আমার অনেক বন্ধুবান্ধব, রিলেটিভস আছে। তাদের সামনে পিসি ওভাবে ঘুরে বেড়ায়। খারাপ লাগে আমার। তুমি ওঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে লোকাল ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ো। অন্য কোথাও গিয়ে ডেরা বাঁধুক। এই কাজটার জন্য টানা ছুটি দিলাম তোমাকে। মিশন সাকসেস হলে জয়েন কোরো। এক্সপেনসেস হিসেবে এই টাকাটা রেখে দাও।

খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা আর বদ্ধ উন্মাদকে ট্রেনে ওঠানো সমান কঠিন কাজ। খুব ভদ্রভাবে হলেও, চাকরিটা তার মানে গেল। যাওয়ার কারণটা সোমনাথদাকে বলা যাবে না। বোঝাই

যাচ্ছে, যে দায়িত্বটা স্যার দিলেন, এটা গোপন রাখাও এ কাজের প্রধান শর্ত।

টাকার বান্ডিলটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল বিভাস। স্যার বললেন, আমি যা বললাম, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তো?

মাথা নেড়ে বিভাস বলে, আমি চেষ্টা করব স্যার।

—চেষ্টা নয়। পারতেই হবে তোমাকে টেক ইট অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ।

শুকনো মুখে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে বিভাস।

পাঁচ

দিন পনেরো হয়ে গেল, বিভাস আর অফিস যায় না। ছেড়ে দেওয়া টিউশনিগুলো ফিরে এসেছে। ছাত্র বেড়েও গেছে দু'টো। এখন সন্ধে ছাত্রদের পড়াচ্ছে বিভাস। দশ হাজার থেকে মাত্র পাঁচশো টাকা খরচ হয়েছে। একদিন ভরদুপুরে পাগলিকে রিকশাওয়ালার সাহায্যে ওঠাতে পেরেছিল রিকশায়। রিকশাওয়ালার সঙ্গে চুক্তি হয়। যতদূর পারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসবে। টাকা যা লাগে দেবে বিভাস।

মিনিট কুড়ির বেশি পাগলি স্থায়ী হয়নি সিটে। রিকশার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে নেমে গেছে। রিকশাওয়ালা গুনেগার নিয়ে গেছে দুশো টাকা। বাকি তিনশো খরচ হয়েছে পাগলিকে খাওয়াতে। ইদানীং স্যারের পিসির খাওয়ার একটু ঝোঁক বেড়েছে। স্টেশন রাস্তায় কোলে সুইটস-এ তার জন্য জিলিপি বাঁধা। পাগলি যত ইচ্ছে খাক, বিল মেটাবে বিভাস। একদিন পাগলির হাত থেকে বিভাস জিলিপির ঠোঙাটা নিয়ে নেয়। এগিয়ে যায় স্টেশনের দিকে। পেছন পেছন আসছিল পাগলি। প্ল্যাটফর্মেও উঠল। তখনই আপের একটা ট্রেন ঢোকে। বিভাস লাফিয়ে ওঠে কমপার্টমেন্টে, পাগলি উঠল না। ইশারায় বারবার ডাকল বিভাস। দৌড়ে পালিয়ে গেল বস-এর পিসি। ট্রেন ততক্ষণে স্পিড নিয়েছে। বিভাস নামল পরের স্টেশন ব্যান্ডেলে। এর চেয়ে সুবিধেজনক সিচুয়েশান বিভাস তৈরি করতে পারেনি। পারবেও না। তাই ডিসিশান নিয়েছে, খরচ হয়ে যাওয়া পাঁচশো টাকা কোনও মতে জোগাড় করে রায়চৌধুরীবাবুকে পুরো দশ হাজারই ফেরত দিয়ে আসবে। এ কথাও বলে আসবে, এই চাকরি করা তার পক্ষে অসম্ভব।

ছাত্ররা বইখাতা গুটিয়ে 'আসি স্যার' 'মাস্টার মশাই আসছি' বলে চলে যাচ্ছে। রাত আটটা বাজতে চলল। আজ আর বেরোবে না বিভাস। কয়েকদিন ধরে বেরোচ্ছিল, পাগলি অন্নপূর্ণা মন্দিরে শুতে আসছে কি না দেখতে। কিছুদিন হল দেখা পাওয়া যাচ্ছে না তার। আবার যে কোনওদিন উদয় হবে।

মেঝে থেকে মাদুর গুটিয়ে দরজার কোনে রাখে বিভাস। রান্নাঘরে গিয়ে ভাত চাপাবে কি না ভাবে। রুটি তৈরি তার ঠিক আসে না। বাইরে হোটেলেও খেয়ে নেওয়া যায়। আসলে মায়ের বাসন কোসন নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে। যেন সাড়া পাওয়া যায় মায়ের।

রান্না ঘরে ঢুকতে যাবে, কাছাকাছি গাড়ির আওয়াজ পেল বিভাস। মনে হচ্ছে তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ল। তার কাছে কে আসবে গাড়ি চেপে? ইঁট ছাতরানো ভাঙাচোরা রাস্তা, রিকশাই ঢুকতে চায় না।

সদরে গিয়ে দাঁড়ায় বিভাস। গাড়ি থেকে নামতে দেখল বসকে। নিজেই চালিয়ে এসেছেন। খুব একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য হয়তো নয়, তবু ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে পড়ে বিভাস।

মুখে ক্ষমাসুন্দর হাসি নিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন স্যার। বললেন, কী ব্যাপার, একদম ডুব মেরে দিলে যে!

বিভাস মাথা নামিয়ে বলে, না, আসলে এখনও...

—জানি কাজটা করতে পারোনি। ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে কী অসুবিধে হয়েছিল। আরও কিছু প্ল্যান দিতে পারতাম।

এর উত্তর অবশ্য আছে। ফোনে কাজের রিপোর্ট করতে স্যার বলেননি। সে কথা খেয়াল না করিয়ে বিভাস বলে, ভেতরে আসুন না স্যার।

রায়চৌধুরী আর বিভাস এখন কানাগড়ের আলো অন্ধকার রাস্তায়। বেশিরভাগ লাইট পোস্টে আলো নেই। কয়েকটা আলোজ্বলা ল্যাম্পপোস্ট বড় গাছের ডালপালার আড়ালে চলে গেছে।

গাড়ি রইল বিভাসের বাড়ির সামনে। স্যারকে নিজের হাতে চা করে খাইয়েছে বিভাস। বস-এর এখানে চলে আসার উদ্দেশ্যটাও জানা গেছে। উনি স্বীকার করেছেন, বিভাসকে দেওয়া কাজটা মোটেই সহজ নয়। মাস পেরিয়ে বছর অবধি টাইম লাগতে পারে। ততদিন বিভাস অফিস যাবে না, এটা অবাস্তব শর্ত। বিভাস এবার থেকে কাজে আসুক, যেমন বলতে এসেছেন, চোখের দেখা একবার দেখতেও এসেছেন পিসিকে।

বিভাস বলেছে, ক'দিন হল এলাকায় আপনার পিসিকে চোখে পড়ছে না। মন্দির চাতালেও শোন না ইদানীং।

স্যার বললেন, তাও চলো, একবার ঘুরে আসি অন্নপূর্ণা মন্দির থেকে। স্টুডেন্ট লাইফে অন্নপূর্ণা মাকে খুব মানতাম, জানো তো, সবাই বলত, ভীষণ জাগ্রত দেবী। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের দিন চুঁচরো থেকে এসে প্রণাম করে যেতাম। নিয়ে যেতাম ফুল।

রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় নেই। গ্রামের দিক বলে সন্ধে থেকেই ফাঁকা হয়ে যায়। দূরে অন্নপূর্ণা মন্দিরের আলো দেখা যাচ্ছে। চুড়োতে লালটুনি বাল্ব। বিভাসের একটা কথা ভেবে ভাল লাগছে, এমনিতে রায়চৌধুরীবাবুর সঙ্গে বিত্তে, পদমর্যাদায় তার যোজন তফাৎ, জন্মভূমি কিন্তু এক জায়গায়। মানুষটা আশ্চর্য নিরহংকারী। কত সহজভাবে হেঁটে যাচ্ছেন বিভাসের সঙ্গে... ভাবনার মাঝপথে বিভাসের দৃষ্টি হোঁচট খায় সামনের দৃশ্যে। এ কী দেখছে সে! ফিট দশেক দূর দিয়ে আড়াআড়ি রাস্তা পার হচ্ছে বেড়াল পাগলি। স্যারের দেওয়া শাড়িটা এখন আরও ছেঁড়াখোঁড়া। কোলে বেড়ালটাও আছে। যেতে যেতে এক ঝলক দেখল বিভাসদের।

বসকে ডেকে দেখাতে যাবে বিভাস, উনি পাশে নেই! কোথায় গেলেন? পেছন ফেরে বিভাস, স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন বস। চোখটা শুধু অনুসরণ করছে পাগলি পিসিকে।

রাস্তার পাশের গাছপালায় মিশে গেল পাগলি। বিভাস বস-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, গাড়িটা নিয়ে এলে ভাল হত স্যার। দু'জনে ধরে বেঁধে তুলে নিতে পারতাম।

মাথা নাড়েন রায়চৌধুরী। বললেন, আগেও চেষ্টা করেছি, লাভ হয়নি। আঁচড়ে কামড়ে নেমে গেছে। মানসিক হাসাপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কলকাতার বাড়িতে রেখেছি। ঠিক ফাঁক বুঝে পালিয়ে এসেছে এই এলাকায়। পাগল হয়ে গেলেও নিজের অঞ্চলটাকে ভুলতে পারেনি মা।

ভেতর ভেতর কেঁপে উঠলেও বাইরে সেটা বুঝতে দেয় না। বিভাস। সে একশোভাগ নিশ্চিত, মা শব্দটা ভুল শোনেনি। বেখেয়ালে স্যারের মুখ থেকে সত্যিটাই বেরিয়ে এসেছে।

রায়চৌধুরী ঘুরে গিয়ে হাঁটতে থাকেন। বিভাসও আর বলে না, মন্দিরটা একবার ঘুরে যান একটু আগে জাগ্রত দেবী মিলিয়ে গেছেন অন্ধকারে। অলক্ষ্যে আশীর্বাদ করছেন সন্তানকে।

শিশুর খাওয়া ও খাওয়ানো

অনেক মায়েরই অভিযোগ, তাঁদের শিশু খেতেই চায় না। দু-একটি ক্ষেত্রে সত্যি হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অভিযোগ অর্থহীন। আসলে কী খাওয়াবেন, কীভাবে খাওয়াবেন এসব সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার জন্য অনেক মা-ই শিশুকে খাওয়াতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে চিন্তায় পড়ে যান। শিশুর একটু একটু করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে হয় খাবারের তালিকা, খাওয়ানোর পদ্ধতিও। বিশেষ করে সদ্যোজাত থেকে তিন বছর বয়স, যেহেতু শিশুর পুষ্টি, বিকাশ বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ সময় খাওয়ানোয় বিশেষ নজর দিতেই হবে। কীভাবে? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পল্লব চট্টোপাধ্যায়।

কী খাবে, কখন খাবে

শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধুই বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। ওই সময় জলও খাওয়ানো যাবে না। শিশুর যখন যেমন চাহিদা থাকবে তখনই খাওয়াতে হবে।

ছ'মাসের পর থেকে ঘরে তৈরি খাবার যেমন ভাত, হালকা স্ট্যু ইত্যাদি দেবেন। ওই সময় দেওয়া যেতে পারে মাছও। তবে মাংস যত দেরিতে শুরু করা যায় ততই ভাল। এক বছরের আগে ডিম দেওয়া চলবে না। এক বছরের পর খাওয়ানো যেতে পারে ডিমের কুসুম। দু'বছরের পর থেকে ডিমের সাদা অংশটাও শিশু খেতে পারবে। বাজার চলতি তৈরি সিরিয়াল না দেওয়াই ভাল। ঘরে সুজি, বা খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়ানো ভাল।

শিশুর ৮-১০ মাসে দাঁত উঠতে থাকে। মুখের ভেতরের ডেভেলপমেন্ট হয় ওই সময়। ফলে দেখা যায়, শিশু যা পায় তাই মুখে দেয়। এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে যতটা সম্ভব সলিড খাবারের মাধ্যমে।

এক বছর বয়সের পর ফিডিং ফ্রম দ্য ফ্যামিলি পট চালু করতে হবে। বাড়ির সবাই যা খাচ্ছে, যেমন খাচ্ছে তখন তাকে সেই খাবার, সেই সময় খাওয়াতে হবে। খুব বেশি ঝাল, তেলমশলাযুক্ত খাবার শিশুকে দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনই একেবারে স্বাদহীন, কোনওরকমে সেদ্ধ করা খাবারও শিশুকে দেওয়া যাবে না। যে খাবারই দেওয়া হোক না কেন তা যেন সুস্বাদু হয়। শিশুকে বাড়ির সবার সঙ্গে নিয়ে খেতে বসবেন। পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি খাওয়া শুরু করে তো ভাল, না হলে আর চেষ্টা করার দরকার নেই। জোর করা যাবে না ওকে খাওয়াতেও। নিজে থেকে যা খায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে মায়েদের।

সাধারণত শিশুর একটা ফিড চলে ৩০ মিনিট, কিছু ক্ষেত্রে একটু বেশি সময়ও লাগতে পারে। তবে ১৫ মিনিটের মধ্যে না

খেলে আবার ৪ ঘণ্টা পরে পরবর্তী ফিডিংএ একইভাবে চেষ্টা করতে হবে।

শুধু সুস্বাদু নয়, খাবার দেখতেও যেন অন্যরকম হয়। রোজ এক খাবার না দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শিশুকে খাবার দিতে হবে। যেমন শিশু ভাত খেতে না চাইলে দেওয়া যেতে পারে ইডলি, দোসা, পোলাও, ঘি ভাত। রুটির পরিবর্তে দেওয়া যেতে পারে পাউরুটি, লুচি, সিঙাড়া। তবে সবই যেন ঘরে তৈরি করা হয়।

রোগা-মোটা

শিশুর রোগা থাকা নিয়ে অনেক মায়ের চিন্তাই অমূলক। যদি দেখা যায় শিশু ঠিকমতো খেলাধুলো করছে, ছটফটে আছে তাহলে রোগা থাকলেও শিশু আসলে সুস্থই আছে। বরং দেখা যায়, মোটা বাচ্চারাই বেশি অসুস্থ। জন্মের পর থেকে শিশুর গ্রোথ চার্ট যদি ঠিকমতো এগোতে থাকে তাহলে ভাবনার কিছু নেই। রোগা-মোটার ক্ষেত্রে কিছুটা জেনেটিক ফ্যাক্টরও কাজ করে। তবে যদি দেখা যায় শিশু ঠিকমতো খেলছে, হাসছে, দৌড়চ্ছে তাহলে চিন্তার কোনও কারণ নেই।

রিগারজিটেশন কী

ছোটবেলায় বাচ্চাদের এই সমস্যা হয়। নবজাতককে খাওয়ানোর পর মুখ থেকে খানিকটা দুধ তুলে দেয়। একে সহজ ভাষায় দুধ তোলা বলা হয়। ইংরেজিতে বলে রিগারজিটেশন। এটা খুবই স্বাভাবিক। শিশু একটু বড় হলে যখন সলিড খাবার খেতে শুরু করে তখন আবার এই ধাত কমতে শুরু করে। কিছু বাচ্চার বমি করার প্রবণতা থাকে। একটু বড় হলে আপনা আপনি এই সমস্যা চলে যায়। কিছু শিশু আবার খাওয়ার পরই খানিকটা খাবার তুলে দেয়। যদি দেখা যায়, শিশুর গ্রোথ ঠিকমতো হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট ভাল তাহলে চিন্তার কিছু নেই। এদের বলা হয় হ্যাপি স্পিটার। বড় হলে এমনিতেই এই সমস্যা দূর হয়।

তবে কিছু শিশু থাকে যাদের খাওয়ানোর খানিকক্ষণ পরেই সব বমি হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রিম্যাচিওর বেবিদের ক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যার সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রোইউসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স বলা হয় এই সমস্যাকে। এটা হলে নানারকম সমস্যা যেমন, নিঃশ্বাসের কষ্ট, খাবার শ্বাসনালীতে ঢুকে ইনফেকশন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একটু বড় শিশুদের রিগারজিটেশন হতে পারে অ্যাজমা থেকে। এক্ষেত্রে শিশুর ওজন না বাড়া, শ্বাসকষ্ট, কাশির সমস্যা থাকে। নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বাচ্চারা এই রিগারগিটেশন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আরও একটু বড় হলে তারা বয়স্কদের মতো বলে অম্বল হয়েছে, কিংবা বুক জ্বালা বা পেটে ব্যথা করছে। এদের কিন্তু চিকিৎসার দরকার। সাধারণ সোডিয়াম অ্যালজিনেট দিয়েই এর চিকিৎসা করা হয়।

সোডিয়াম অ্যালজিনেট কী

সোডিয়াম অ্যালজিনেট এমন একটা পদার্থ যা খাওয়ানোর পর খাবারগুলো ওপর দিকে উঠতে পারে না। শিশুকে খাবার দেওয়ার পর এটা খাওয়ানো হলে পেটে গিয়ে একটা ফোম তৈরি হয়। র‍্যাফটের মতো খাবারের ওপর দিয়ে যা ভাসতে থাকে। ফলে খাবার ওপর দিকে উঠে আসতে চাইলে একে তা বাধা দেয়। তখন রিগারজিটেশন এর সমস্যা হয় না। যেহেতু একেবারেই স্থানীয়ভাবে কাজ করে তাই এর কোনও সাইড এফেক্টস নেই। এটা নিরাপদ বলে সদ্যোজাত শিশুদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে দেওয়া হয় শুধুই সোডিয়াম অ্যালজিনেট। এতে র‍্যাফট তৈরি হয়ে রিফ্লাক্স বা দুধ ওপরে ওঠার সমস্যা কমে যায়। যদিও একটু বড় শিশুদের ক্ষেত্রে সোডিয়াম অ্যালজিনেট-এর সঙ্গে মেশানো হয় অ্যান্টাসিড। যা বুকজ্বালা, অম্বলের প্রবণতাও কমিয়ে দেয়।

ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে
ফোন ৯৮৩০১৭৮৯৮৭

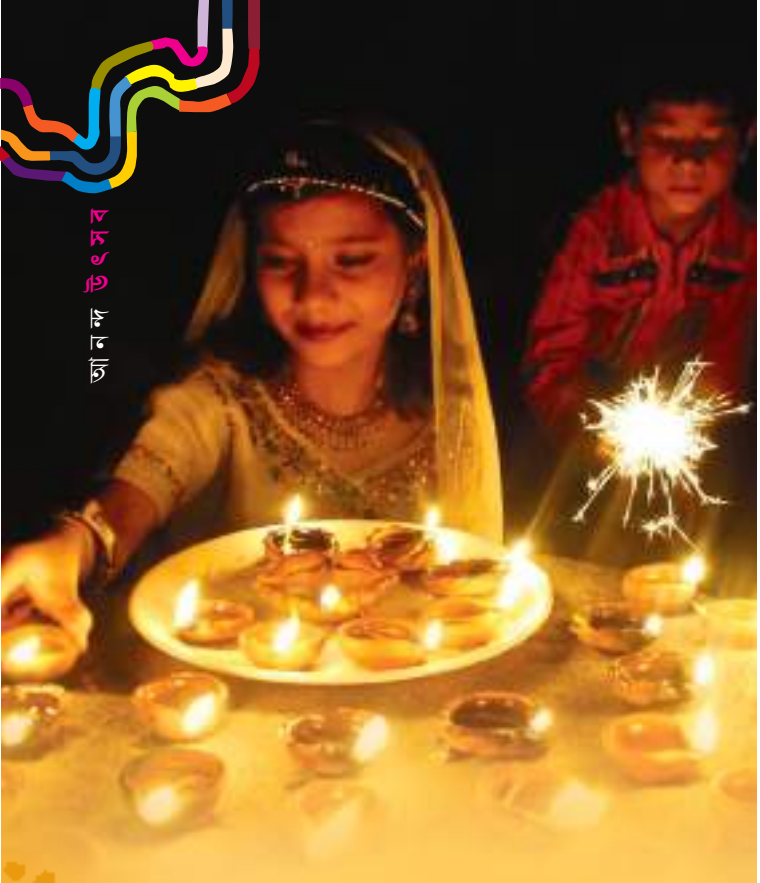

হঠাৎ বিপদ

পুজোর আনন্দ, সঙ্গে সতর্কতা

পুজোয় নতুন জামা, জুতো পরা আছে, আছে রাত জেগে উত্তর থেকে দক্ষিণ প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখা, বাজি পোড়ানো, সময়ের তোয়াক্কা না করে নানারকম খাবার খাওয়া। আর এ সবের সঙ্গে অবশ্যাম্ভাবীভাবে থাকে কিছু সমস্যাও। যেমন অ্যাসিডিটি, নতুন জুতোর ফোস্কা, কিংবা বাজি পোড়াতে গিয়ে অঘটন ঘটা। প্রথমেই এসবের গুরুত্ব না দিলে পরবর্তীকালে এর থেকেই জটিলতা দেখা দিতে পারে। কী করবেন হঠাৎ এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিলে? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এসব সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় জানানো হচ্ছে এবার। জানাচ্ছেন **কাকলী চক্রবর্তী**

পেটের গন্ডগোল

- রাস্তা ঘাটে বিক্রি হওয়া রঙিন পানীয় কিংবা চাউমিন, এগরোল-এ ব্যবহৃত কৃত্রিম রঙের থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। ফলে এসব খাওয়ার পরেই গা চুলকানো হাঁচি-কাশি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তেমন হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ খেয়ে নিন।
- পুজোর মধ্যে একদিন তো রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পোগ্রাম থাকবেই। সেখানে খাওয়ার পর অ্যাসিড হলে খেয়ে নিন কোনও অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ। (ম্যাগনেট সিরাপ)
- পেটে গ্যাসের সমস্যা হলে বেশি করে জল খান। আর টয়লেটে যান। খানিকক্ষণের মধ্যেই শরীর অনেক সুস্থ লাগবে। হজম ঠিকমতো না হলে খেতে পারেন এনজাইম প্রিপারেশন। (এনকারমিন সিরাপ)
- বাইরে খাওয়ার পর ডায়রিয়া শুরু হলে বাড়িতে বানানো এক চিমটে নুন আর ১ চামচ চিনির ও আর এস খান। দোকান থেকে তৈরি ও আর এস (ল্যাকোলাইট-জেড)ও কিনতে পারেন।

মচকে যাওয়া

পুজোয় এত ভীড় হয় যে মাটির দিকে লক্ষ রেখে চলা প্রায় অসম্ভব। তাই সবাইকে উর্ধ্বমুখেই চলতে হয়। ফলে রাস্তার ছোট খাটো গর্তে পা পড়ে মচকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রবল। এরকম হলে সঙ্গে সঙ্গে পায়ে বরফ সেঁক দিতে হবে। চোটের জায়গায় লাগানো যেতে পারে ব্যথা কমানোর জেল বা ক্রিম।

- পায়ের চোট বেশি হলে তখন সৌন্দর্যের কথা না ভেবে বাঁধতে হবে ক্রেপ ব্যান্ডেজ।
- খুব বেশি ব্যথা হলে ব্যথা কমানোর ওষুধ খেতে হবে।
- ক্ষত গভীর হলে যদি সেখান থেকে রক্তপাত হয় তাহলে রুমাল দিয়ে জায়গাটা চেপে রাখতে হবে। প্রয়োজনে ব্যান্ডেজ করিয়ে নিতে হবে। রাস্তায় কাটলে টিটেনাস নিতে ভুলবেন না ২৪ ঘণ্টার মধ্যে।
- পায়ের পেশিতে টান লাগলে বা মচকে গেলে পরদনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঠাকুর দেখতে গেলে বিপত্তি বাড়তে পারে। তাই এরকম হলে এবারের বাকি ঠাকুরগুলো টিভিতেই দেখে নেবেন। একদম ঘোরাফেরা করবেন না। যন্ত্রণা জটিলতা সবই বাড়তে পারে।

ফোস্কা

পুজোর সময় জামার সঙ্গে নতুন জুতো চাই-ই। অনেকেই পুজোর জুতো পরেন ঠাকুর দেখার জন্যই। আর নতুন জুতো পরে হাঁটাহাঁটি করার পর অবধারিতভাবে ফোস্কা পড়ে। ব্যথা হয়। ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। কাজেই ঠাকুর দেখতে বেরনোর অন্তত দিন পনেরো আগে থেকে নতুন জুতো পরে হাঁটা চলা করুন। বাইরে পরে বেরলে পুরনো হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে ঘরেই পরুন।

- জুতো পরে দেখুন, কোন জায়গাটায় একটু ব্যথা লাগছে। সেই জায়গায় কোনও অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম বা ভেসলিন লাগাতে পারেন।
- ফোস্কা পড়লে সেখানে ব্যান্ডেড লাগিয়ে তারপর জুতো পড়ুন।

শক খাওয়া

পুজোয় বহু প্যান্ডেলেই বৈদ্যুতিক আলোর সজ্জা থাকে। সেখান থেকে দর্শনার্থীদের শক খাওয়ার উদাহরণও বড় কম নয়। কারও তেমন সমস্যা হলে প্রথমেই দেখতে হবে শরীরের কোনও অংশ বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লেগে আছে কি না। থাকলে সঙ্গে সঙ্গে মূল সুইচ অফ করার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যুৎ তারের সংস্পর্শ থাকাকালীন সেই ব্যক্তিকে ছোঁয়া যাবে না।

- বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন হলে রোগীর জামা-প্যান্ট ঢিলে করে দিন। লক্ষ্য করুন শ্বাস ঠিকমতো পড়ছে কি না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কখনওই জলের ঝাপটা দেবেন না।

বাজি পোড়ানো

পুজো মানেই বাজির উৎসব। শুধু কালী পুজো নয়, দুর্গাপুজো এমনকী শান্তশিষ্ট লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায়ও বাজি পোড়ানো হয় এখন। শব্দবাজির প্রকোপ একটু কমলেও আতসবাজির রমরমা চলছেই। আর এতে অনেক সময়ই বিপত্তি দেখা দিতে পারে। চোখে বাজির ফুলকি এসে পড়তে পারে। তেমন হলে চোখে প্রথমেই ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে হবে।

- কখনওই চোখ রগড়ানো চলবে না। দোকান থেকে কিনে কোনও আই ড্রপও না দেওয়াই ভাল।
- তবে এ জাতীয় সমস্যায় যত তাড়াতাড়ি চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া যায় ততই ভাল।
- হাতে বাজি ফেটে গেলে বরফ ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে রাখুন, যতক্ষণ না জ্বালাভাব কমে। জ্বালা কমলে জায়গাটা মুছে লাগিয়ে দিন কোনও অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম (সুফ্রেট-এস এস ডি)।
- কোনও ভাবে জামা কাপড়ে আগুন লেগে গেলে সেগুলো খোলার চেষ্টা না করে জল ঢেলে নেভানোর চেষ্টা করুন।
- পুড়ে যাওয়া অংশটায় যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা জল ঢালতে থাকুন।
- হাত বা পা পুড়ে গেলে গামলা অথবা বালতির জলে বরফ দিয়ে ডুবিয়ে রাখুন, যতক্ষণ না জ্বালাভাব কমে ততক্ষণ। এতে করে পোড়াভাব বেশি দূর এগোতে পারবে না।
- জ্বালাভাব কমলে পোড়া জায়গাটা শুকনো করে মুছে নিয়ে পোড়ার জন্য তৈরি বিশেষ ধরণের মলম লাগান। (সুফ্রেট-এস এস ডি)
- ফোস্কা পড়ে গেলে কখনই তা সূচ বা অন্য কোনও কিছু দিয়ে গেলে দেবেন না। প্রয়োজনে চিকিৎসক পরিশুদ্ধ সিরিঞ্জ দিয়ে ফোস্কার ভিতর থেকে জল বের করে দিতে পারেন।
- ফোস্কা পড়া জায়গাটার জ্বালাভাব কমানোর জন্য জাইলোকেন এবং সিলভার সালফাডায়াজিন মিশ্রিত মলম লাগানো যেতে পারে। (সুফ্রেট-এস এস ডি)
- বাড়িতে রান্না করার সময় ছোটো খাটো পোড়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন সুফ্রেট-এস এস ডি ক্রীম।

পাঁচদিনে পঞ্চকন্যা

বাংলা জনপ্রিয় ধারাবাহিকের পাঁচ অভিনেত্রী সেজেছেন পুজোর পাঁচ দিনের জন্য পাঁচটি শাড়িতে।

সাজিয়েছেন সাবর্ণী দাস
ছবি অরিজিৎ দত্ত
প্রশাধন : সুভাষ বেরা
কেশ সজ্জা : আলপনা প্রধান

ষষ্ঠী

অঙ্কিতা : বিন্নিধানের খই, ইটিভি বাংলা
শাড়ি : উইভার্স স্টুডিও, বালিগঞ্জ

সপ্তমী

গীতশ্রী : রাশি, জি বাংলা
শাড়ি : বাইলুম, হিন্দুস্তান পার্ক

অষ্টমী

পায়েল : বেহুলা, স্টার জলসা
শাড়ি : সুচিস্মিতা

দশমী

প্রিয়ম : নিয়তি,
ইটিভি বাংলা
শাড়ি : উইভার্স
স্টুডিও, বালিগঞ্জ

নবমী

ঐন্দ্রিলা : সাত পাকে বাঁধা, জি বাংলা
শাড়ি : বাইলুম, হিন্দুস্তান পার্ক

গৃহসজ্জা

পুজোয় ঘরে আনুন দেশজ সাজ

সরকারি চাকুরে প্রমিতার পথ ধরে কীভাবে নিজের বাড়ি সুন্দর করে তুলবেন জানিয়েছেন সাবর্ণী দাস

প্রমিতা কাজ করে সরকারি অফিসে। প্রাদেশিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ভাল র‍্যাঙ্ক পেয়েছিল। প্রমিতার এই সিদ্ধান্তে বাকি সবাই অবাকই হয়েছিল! বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরাই তখন হয় ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নয় বিজ্ঞাপনে কপি রাইটার কিংবা বিদেশি ব্যাঙ্কে ব্যাংকার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর প্রমিতা? ঘাড় গুঁজে পড়া মুখস্ত করে চলেছে ডাবলিউ-বিসিএস হওয়ার জন্য। যাই হোক তার এই দেশপ্রীতি যে কেবল চাকরি পাওয়ার জন্য নয় তা তার জীবন ধারণের মধ্যেই স্পষ্ট! না, কেবল তাঁতের শাড়ি পরে বলে নয়, তার ঘর বাড়ি দেখলেও বোঝা যায় যে তার জীবনে দেশজ প্রভাব কত গভীর।

বাড়িটা তার তেমন বড় নয়। কিন্তু বড্ড ছিমছাম করে সাজানো। যেমন পয়লা বৈশাখে সে সবকটা জানলায় ব্লাইন্ডস, মানে যাকে বলে চিক দিয়েছিল। অফিসে লাগানো হয় যে পলি ব্লাইন্ডস, তার কথা বলছি না। লাগিয়েছিল সুতো দিয়ে বোনা সরু সরু বাঁশের ব্লাইন্ডস। দারুণ দেখতে! যে কোনও অন্দর সাজেই তা মানানসই। এবারের পুজোয় সে দরজার পরদাগুলো পাল্টাবে। তার বদলে লাগাবে জুটের ভার্টিকাল ব্লাইন্ডস। সে দেখে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এম্পোরিয়ামগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। একেবারে মনের মতো!

প্রমিতা ডাইনিং টেবল সেটটা বদল করবে। আজকাল মাদুরের টেবল ম্যাট পাওয়া যাচ্ছে। যার চারধারটা জরির পাড় দেওয়া। একই রকমের নানারং দেবে টেবিলের মাঝ বরাবর। কেবল কিনতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কারণ ফুশিয়া গোলাপি মানে রানি রংটা তখন ছিল না। এই সপ্তাহে স্টক এসে গেলে সেটা সে কিনে নেবে। ডাইনিং টেবিলের পাশে সাইড বোর্ডের সামনের জন্য সে খুব সুন্দর ফুশিয়া পিংকের একটা ম্যাট তুলে নিয়েছে। কোনও প্ল্যান ছিল না, কিন্তু রংটা এক্কেবারে তার কালার প্যালেট-এ যাচ্ছে বলে এটা তার ডাইনিং এরিয়াতে সে চুজ করল। এই অঞ্চলে

কাভার বানাবে। দক্ষিণাপনের বিখ্যাত জুট শপ থেকে সে নেবে জুটের দড়ি। যা পাতবে কাচের সেন্টার টেবিলের নিচে।

তবে ফ্ল্যাটের যে মূল দরজা সেটা খুললেই আছে ছোট্ট এক চিলতে করিডর। যেখানে আছে একটা সুন্দর লুভ্যর করা শু র‍্যাক। মানে সামনে ঝিরি ঝিরি পাল্লা দেওয়া। তার ওপরে রাখা আছে সেরামিক-এর ফুলদানি। এই ফুলদানি সে কিনেছিল বাইপাসের ধারের রাস্তার সেরামিক-এর পসরা থেকে। বন্ধুরা বিশ্বাসই করতে চায় না যে এটা ওইখানকার। প্রমিতার চোখ! ঠিক বেছে বেছে মানানসই জিনিসটাই তুলেছে। যাই হোক, অনেকদিন হল সে ভাবছিল এই অঞ্চলের দেওয়ালে সে কিছু ঝোলাবে। কিন্তু কিছুতেই পছন্দসই কিছু পাচ্ছিল না। জুট শপে ছোট একটা দড়ি দেখে হঠাৎই মনে হল, আরে এটা বাঁধিয়ে টাঙানো যায়। দারুণ হবে। মাত্র ২৫০ টাকায় সে বাজিমাৎ করে ফেলল। আর অন্য দেওয়ালে তার সাত বছরের মেয়ের নানা সময়ের ছবি সাদা কালোতে প্রিন্ট করে আগেই টাঙিয়ে দিয়েছিল। করিডরের এই দেওয়ালের মজা হল কোনও ছবিই বয়স অনুযায়ী সাজান হয়নি। আর এক মাপেও করেনি। এলোপাথাড়িপনার মধ্যে এক দারুণ মজা আছে। তবে এটা বুঝেশুনে করতে হবে। না হলে ভাল দেখাবে না।

প্রমিতার রুচি কেবল তার ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। সে তার অফিসটাও দারুণ সুন্দর করে তুলেছে। প্ল্যান করে ইন্টিরিয়র করেছে তা নয়। সরকারি অফিসে তা সম্ভবও নয়। তবে কর্মসূত্রে এদিক ওদিক যাওয়ার কারণেই চোখে ভাল কিছু

সাইডবোর্ড আর টেবিলের ধারে একটা জায়গা ছিল। সেখানে একটা মাদুরের প্লান্টার রাখার প্ল্যান করেছে। না সেটা ফুশিয়া পিংক নয়, স্বাভাবিক মাদুরের অফ হোয়াইট রঙেরই হবে। কেবল তার মধ্যে সে দেবে ফুশিয়া গোলাপির নানা আকারের কাঠি, ইত্যাদি। দারুণ মানাবে।

প্রমিতা এই পুজোতে বাড়ির যে যে অঞ্চলগুলো নতুন করে সাজাবে ভেবেছে তার মধ্যে ডাইনিং এরিয়ার প্ল্যানিং তো বলাই হল। তার বাজেটে এবার শোওয়ার ঘর নেই। কেবল বসার ঘরেরই কিছু কিছু পাল্টাবে। তাও পুরোটা নয়।

কাঠের সোফা সেট সে সম্প্রতি কিনেছে একটি বড় হোম ডেকর মল থেকে। প্রচুর ডিসকাউন্ট সেল-এর সময় বেশ সাধ্যের মধ্যে এই দারুণ অফারটা লুফে নিয়েছে। তসর রঙের গদির কাভার ছিল বলে সে বদল করেনি। কিন্তু বড় পিছনের কুশনের মধ্যে সে দিতে চায় নানা আকারের ছোট কুশন। খুব উজ্জ্বল রঙের কিছু ব্রোকেড-এর মেটিরিয়াল কিনে সে তার

পড়লে কেনার অভ্যাসটা তার চিরকালের। অফিসের জানলার ব্লাইন্ডের ওপর শঙ্খের পরদা ঝোলানোর আইডিয়া থেকে শুরু করে, ঘরের চেয়ারের গদিতে দিশি তাঁতের আপহোলস্ট্রি করা, টেবিলে পোড়ামাটির পেন স্ট্যান্ড যেমন রাখা তেমনই ঘরের কোণে বাঁকুড়ার ঘোড়ার সঙ্গে গাছ ও পিতলের পিলসুজের মিলমিশ অফিসের প্রত্যেকের প্রশংসা পেয়েছে। তাই এই পুজোতে চলুন আমরাও দিশি দর্শনে বেরোই। টুকটুক করে এই সুন্দর অথচ সস্তা জিনিসগুলো দিয়ে আমাদের চারপাশটা ভরিয়ে ফেলি।

কথা ও কাহিনি

দোসর

নীলাঞ্জন নন্দী

এই ভ্যাপসা গরমে হাতে আর ঠোঁটের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। কিছুটা পরিশ্রমে, আর বেশির ভাগটাই অজানা একটা অনুভূতিতে! জীবনে অনেক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটেছি আমি। আমার পেশাটা আমায় পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়েছে। এক মাস হল স্বেচ্ছা-অবসর নিয়েছি। কেউ জানল না, কেউ কোনও প্রশ্নও করল না। জাস্ট, নিজেকে উইথড্র করে নিলাম। কলকাতায় ষোলশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটা বেচতে দিন কুড়ি সময় লাগল। ব্যাঙ্কের যে অ্যাকাউন্ট থেকে লেন-দেন হল, সেটাকে ক্লোজ করতেও দিন দুয়েক। তারপর নিজের অস্তিত্বের যতটা সম্ভব সমস্ত প্রমাণ মুছে দেওয়া। সে এক সময়সাপেক্ষ কাজ। আমার সুবিধা ছিল। নেক্সট অফ কিন অথবা নিকটাত্মীয় বলতে কেউ নেই। প্রশ্ন, উত্তর, কৈফিয়ত, এসবের কোনও জায়গা কোনওদিনই ছিল না। আমার জীবনে। অন্তত মা মারা যাবার পর তো আর নয়।

পুরীতে এই বাড়িটার বায়না করে রেখেছিলাম মাস তিনেক আগে থেকে। স্বর্গদ্বারে ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেলের পাশের গলিটা দিয়ে ঢুকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। ছোট বাগান নিয়ে ছ'কাটা জমির ওপর বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটা। গেটের ফলকে লেখা 'নোঙর-ঘর' (১৯৫২)। প্রায় ষাট বছর পেরিয়ে এসেও বাড়িটার ক্ষয় অতি সামান্য। একটা অফিসের হলিডে হোম ছিল এটা। ওদের লিজ ফুরিয়ে যায়। আর তখনই আমার 'পুরীতে বাড়ি চাই' বিজ্ঞাপন দেখে এই বাড়ির বর্তমান মালিক ডাঃ মনিরথ আমায় চিঠি লেখেন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর আমি আপাতত দুবছরের জন্যে বাড়িটা ভাড়া নিই। গতকাল 'পুরী এক্সপ্রেস' ধরে যখন ফার্স্ট এসির আরামদায়ক কামরায় গুছিয়ে বসছি, তখনই চোখে পড়ছিল হাওড়া শহরতলির আলোর রোশনাই। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। চারিদিকে সেই মন কেমন করা গন্ধ আর রঙ। বাতাসে অদ্ভুত এক সুর যা সবাই শুনতে পায় না। গতকাল ছিল মহাষষ্ঠী। বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো।

পুরীতে ট্রেন ঢুকেছে সময়মতো। রিক্সা নিয়ে 'নোঙর-ঘরে' পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। লাগেজ বলতে একটা ছাব্বিশ ইঞ্চি ট্রলি ব্যাগ আর চামড়ার একটা ডাফেল ব্যাগ। এই দুটো ব্যাগেই জিন্দেগি কাটিয়ে দিলাম। অশোক চন্দ নামে এক বাঙালি ভদ্রলোক এই বাড়ির হলিডে হোম স্থানীয়ভাবে দেখাশোনা করতেন। তাকেই বহাল করেছিলাম আমার আসার আগে সব প্রস্তুতি ও ঝাড়-পোঁছ করার জন্যে। মাস দুয়েক আগে একবার এসে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম মিটিয়ে গেছি। আজ স্টেশনেও অশোকবাবু এসেছিলেন। বাড়িতে পৌঁছে দেখি সব পরিপাটি। ঝকঝক করছে। নতুন ফ্রিজ এসে গেছে। এমনকী গ্যাসের সিলিন্ডার আর স্টোভটাও নতুন। রান্নাবান্নার লোক রাখিনি। অশোকবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'রান্নার জন্য কোনও ওড়িয়া ঠাকুর দেখে দিই?'

'না তার দরকার পড়বে না। রান্না'র অভ্যেস আছে।'

'আপনি একা থাকবেন জানতাম, কিন্তু রান্না বা অন্য কাজের লোকও লাগবে না, ভাবিনি!'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না অশোকবাবু—আমি এভাবেই একা একা কেবল এই দুটো ব্যাগ নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। আমার একা থাকতেই ভাল লাগে।'

'আপনি কী করেন?'

'এখন রিটায়ার্ড।'

'না মানে কী করতেন? লেখক বা ওই গোছের কিছু?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। মানুষের জীবনের গল্প লিখতাম।'

এরপরে আর অশোকবাবু আমায় ঘাঁটাননি।

দু কাপ চা বসালাম। অশোকবাবু চা খেয়ে বিদায় নিলেন। অবশ্য বিদায় নেওয়ার আগে অশোকবাবু এই প্রশ্ন করলেন

'এদিকটা তো একটু ফাঁকা ফাঁকা। এতবড় দোতলা বাড়ি গোটা বাড়িটায় আপনি একা। ভয় করবে না তো?'

'কীসের ভয়? চোর-ডাকাতের? তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা আমার আছে। মিথ্যে বলছি না।'

'না-না। সেসব কিছু নয়। পুরীতে ছিঁচকে চুরি ছাড়া ওইসব ডাকাতি-রাহাজানি গোছের কিছুই ভয় নেই। আমি বলছিলাম "অন্য ভয়ের" কথা!'

'অন্য ভয়?'

'আসলে বেশ কিছু বছর আগে এইরকমই পুজোর সময় একজন বোর্ডার এখানে থাকতে এসেছিলেন। দেখে মনে হত ডিপ্রেশনের পেশেন্ট! দশমীর পর হলিডে হোম প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু উনি তখনও ফেরার টিকিট কাটেননি। আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন, উনি নাকি বন্ধ ঘরগুলো থেকে গভীর রাতে নানারকম অদ্ভুত শব্দ শুনতে পান। তারপরের দিন বললেন উনি মধ্যরাতে কয়েকটা ঘর থেকে কথাবার্তাও শুনেছেন। আমি বিশ্বাস করিনি। কারণ এমন কথা আগে কেউ বলেনি কখনও।

'কিন্তু পরের দিন ওই ভদ্রলোককে ঘরের মাঝখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। শুধু চোখ দুটো—'

'কী হয়েছিল চোখ দুটোয়?'

'একেবারে বিস্ফারিত। যেন কিছু একটা দেখে ভয়ে হার্টফেল করেছেন। তারপর বিস্তর পুলিশি ঝামেলা হলেও খবরটা সেভাবে ছড়ায়নি।'

অশোকবাবু বিদায় নেওয়ার আগে বলেছিলাম—'তেমনটা আমার সঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

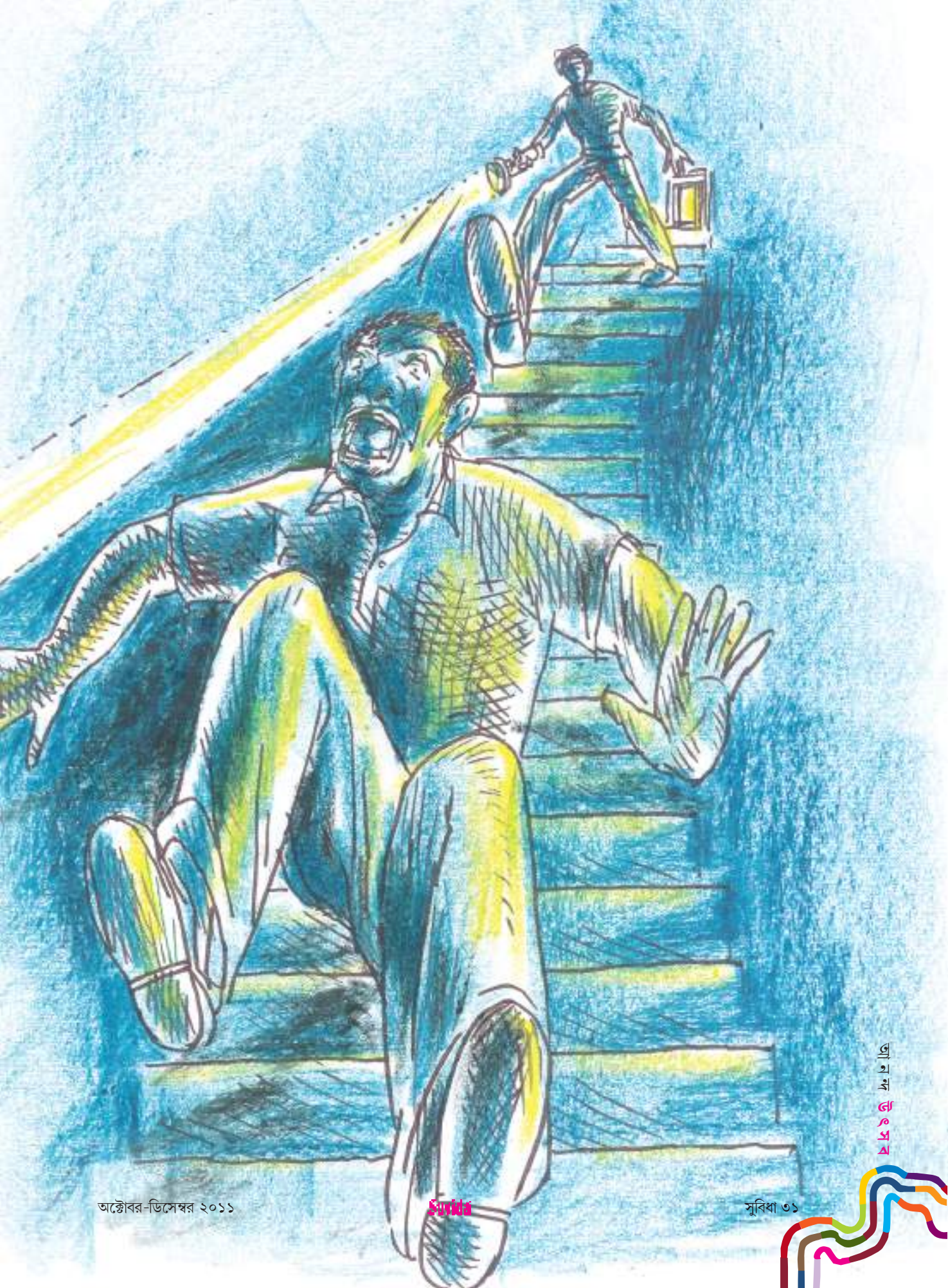

অশোকবাবু চলে যাওয়ার পর ঘটল ঘটনাটা।

প্যাকার্স অ্যান্ড মুভার্স-রা মালপত্র গুছিয়ে রেখে গেছিল, তবু যে ঘরটা ডাইনিং-কাম-কিচেনে পরিণত করেছি তার একটাই মাত্র জানলার পাশে ডবল ডোর ফ্রিজ-টা রেখে গেছে অশোকবাবুর লোকজন।

জানলাটা বোধহয় দক্ষিণমুখো। বেশ হাওয়া আসছে। জানলার বাইরে একটা জারুল গাছ। পুরী বা সমুদ্রতীরের শহরে এর আগে জারুল গাছ চোখে পড়েনি আমার। বাড়িটার বাউন্ডারি ওয়াল প্রায় ফুট সাতেক উঁচু। সাধারণ কোনও রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং-এর এতটা উচ্চতার পাঁচিল হয় না। 'নোঙর-ঘর'-এর মালিক হয় খুব লাজুক বা ইন্ট্রোভার্ট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আর নয়তো কোনকিছুর থেকে বাড়িটাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কী?

ফ্রিজটা ভারী কিছু নয়। তাছাড়া তলায় স্ট্যান্ডে চাকা লাগানো রয়েছে। দেয়ালের বাঁ দিকে ঠেলতে ইঞ্চি খানেক নড়েই আটকে গেল ফ্রিজটা। আবার ঠেলা লাগালাম। নড়ল না। জগদ্দল পাথর।

ফ্রিজ আর দেয়ালের মাঝের ফাঁকটায় চোখ রাখলাম।

এক রুপোলি ধাতব বস্তুতে ফ্রিজের বডিটা আটকে গেছে। বাধা পাচ্ছে। তাই নড়ছে না। দেখে মনে হচ্ছে কোনও ক্যাবিনেট বা ফার্নিচারের হাতল। কিন্তু...

এবারে ঠান্ডা একটা ধাতব স্পর্শ। মসৃণ। ভাল করে জিনিসটাকে বোঝার জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করে ওটাকে অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম ওটা একটা দরজার হ্যান্ডেল। ওটাতেই বাধা পেয়েছে ফ্রিজটা। ভেবে পেলাম না, কেন একটা দরজার সামনে, সেটাকে আড়াল করে ফ্রিজটাকে রাখা হয়েছে!

এবারে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রিজটাকে আরও বাঁ পাশে সরিয়ে দিলাম। তিন ফুট চওড়া আর ম্যাক্সিমাম চার ফুট উচ্চতার একটা দরজা। দেওয়ালের মাঝে বসানো। ঠিক নাটকের ব্যাকড্রপে সিনে যেমন দরজা বা জানলা আঁকা থাকে। প্রথমেই যে কথাটা মাথায় এল—

এটা কি কোনও গুপ্ত দরজা? ইচ্ছে করেই আড়াল করে রাখা হয়েছিল? আমার অভ্যস্ত শরীর আজানা আশঙ্কায় টানটান হয়ে উঠল।

এর মধ্যেই দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে ফেলেছি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাড়ির পিছনের প্যান্ডেলে ঢাক বেজে উঠল। বোধহয় সপ্তমীর পুজো। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম জোড়া ঢাক বাজছে। ঢাকের শব্দ আর বাজনার ধরনটা নতুন। কলকাতার পুজোমন্ডপের মতো নয়।

একবার আমার একটা বিশেষ project-এর জন্যে বাজনা শুনে সংকেত বোঝার ব্যাপার ছিল। সেই ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া শহরে। তখন গোপনে এই সংকেত বোঝার প্রশিক্ষণও নিয়েছিলাম।

এই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা খোলা দেওয়াল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পুজোর ঢাক শুনে তেমন কোনও সংকেত খুঁজে পেলাম না। কেবল মনে হতে লাগল, এ যেন আদিম যুগের বাজনা। হয়তো কোনও সিনেমায় দেখেছি এমন সিন—যেখানে বলি দেওয়ার আগে উদ্দাম তালে বাদ্যযন্ত্র 'শেষের-সময়' ঘোষণা করছে!

গুরুগম্ভীর ঢাকের শব্দ আর সামনে এই খোলা দরজা! চোখ বন্ধ করে দুর্গা প্রতিমার মুখটা মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

কিন্তু না—মনে করতে পারলাম না! একটা অসাড় করে দেওয়া ঘোর যেন চারিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে মাথায়। দরজার ও প্রান্তে প্রথমে অন্ধকার!

তারপর চোখটা সয়ে যেতেই দেখতে পেলাম পাঁচ-ছয় ধাপ সিঁড়ি। নিচে নেমে গেছে। তার মানে বেসমেন্ট?

ঢাকের শব্দটা এবারে মনে হচ্ছে—দূর থেকে ভেসে আসছে। আগের মতো স্পষ্ট নয়। কপালের দু'পাশে আর কানের ঠিক পিছনে ঠান্ডা ঘামের স্রোত। আমারও টেনশন হচ্ছে?

পকেট থেকে সরু জাপানি টর্চটা বের করে দরজার ওপারে পা রাখলাম। সিঁড়িগুলো সাধারণ বাড়ির বেসমেন্ট-এর সিঁড়ির মতো সিমেন্টের বা কাঠের নয়।

এ সিঁড়ি জীর্ণ পাথরের। পুরনো কোনও ইউরোপিয় প্রাসাদ বা কেল্লায় যেমন হয়। চোখের সামনে পাঁচ-ছ'টা সিঁড়ি। তারপর অন্ধকার। টর্চের আলোয় কিছুটা কালো দূর হলেও, অনেকটাই হচ্ছে না। আমার টর্চটা আকারে ছোট হলেও একেবারে 'ধানি লঙ্কা'। দুটো Led Bulb! সাদা আলোর রেখা প্রায় আধ কিলোমিটার অবধি অতিক্রম করে। কিন্তু এই অন্ধকার আর আজব পাতালঘরে সেটা ফুট ছয়েকের বেশি পৌঁছচ্ছে না। অন্ধকার গিলে নিচ্ছে আলোর কণিকাগুলোকে।

সাবধানে নামতে শুরু করার আগে কয়েক ধাপ সিঁড়ি আবার উঠে দরজার হাতলে একটা দড়ি বেঁধে সেটাকে টানটান করে পাশের জানলার গ্রিলটায় অপর প্রান্তটায় বেঁধে দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে অজানার উদ্দেশে নামতে নামতে যদি হঠাৎ কিচেনের এই রহস্যময় দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তো এটা আমার সমাধি হয়ে যেতে পারে। কারণ, ওইদিকে দরজা খোলার সুদৃশ্য হাতল থাকলেও এই প্রান্তে সে সবের বালাই নেই। কেবল মসৃণ দরজার কাঠ।

একমনে নামতে নামতে হঠাৎ realise করলাম অনেকটা নেমে এসেছি, তবু floor বা মেঝের দেখা নেই। একটু বাঁ-পাশে চেপে আর ঘুরে সিঁড়িগুলো নিকষ আঁধারের বুকে নিরন্তর নেমে চলেছে। পাতালে নামতে আর কত বাকি? শরীর-টাকে ঘুরিয়ে পিছনে দেখি ওই অনেক দূরে উপরে খুলে রাখা দরজাটাকে ছোট্ট জানলার মতো লাগছে। রাস্তা থেকে ছ'তলার আলোকিত জানলা যেমন লাগে!

'ছ-তলা?' একটা বাড়ির নিচে ছ-তলা নেমে এসেছি আমি! কথাটা মনে হতেই দুটো জিনিস হুড়মুড়িয়ে যেন আমায় ধাক্কা মারল। এক, আমি এতক্ষণ realise করিনি, তাপমাত্রা কমেছে অনেকটা। এখানে আর ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হয়তো বা থেমে গেছে। ঠান্ডা এতটা বেড়েছে, যে মনে হচ্ছে একটা blazer বা সোয়েটার থাকলে মন্দ হত না। এও এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড! পুরীর মতো সমুদ্রতীরবর্তী একটা শহরে মাটির নিচে, হাওয়া-বাতাস রহিত basement-এ পনেরো-ষোল ডিগ্রি তাপমান? পুরীর এই বালি-বালি ভূ-প্রকৃতিতে এত গভীরে নির্মাণ-ই বা সম্ভব হল কীভাবে? দ্বিতীয় যে জিনিসটা ধাক্কার মতো অনুভব করলাম—সেটা 'গন্ধ'। গন্ধটা unpleasant। খারাপ। গন্ধ চেনার কিছুটা বিদ্যে আমার থাকলেও এই বিজাতীয় ঘ্রাণটিকে চিহ্নিত করতে পারলাম না। আস্তে আস্তে অন্ধকারটা পাতলা হয়ে এল এবং দেখতে পেলাম পাথরের সিঁড়িগুলো একটা ছোট পাক নিয়েই একেবারে তলায় একটা বড় চাতালের মতো জায়গায় পৌঁছেছে। বড় বড় রুক্ষ পাথর বসানো মেঝে। চাতালটা প্রায় হাজার স্কোয়্যার ফিটের। সিঁড়ির উল্টো দিকে চাতালের মাটি ফুঁড়েই যেন গাছ বেরিয়েছে। সেই গাছগুলো এত লম্বা, যে প্রায় আকাশ ছোঁয়। কিন্তু এখানে আকাশ কই! গন্ধটা এখানে আরও একটু বেশি। ডান পকেট থেকে রুমালটা বের করে নাকচাপা দিলাম। ঠিক তখনই পেলাম শব্দটা! গায়ে কাঁটা দেওয়া একটা ডাক। এ ডাক কোনও মানুষের হতে পারে না। আমার শোনা

কোনও জানোয়ারের ডাকের সঙ্গেও এর মিল নেই। শব্দটা গাছগুলোর পিছন থেকে আসছে আর গন্ধটাও তীব্র হচ্ছে।

বিপদের গন্ধ পেতে অভ্যস্ত আমার শরীর আবার টানটান হয়ে উঠল। ভীষণ ইচ্ছে করছে আমার কিচেনটায় পৌঁছে যেতে। ইচ্ছে করছে বাড়ির পিছনের পুজোমন্ডপে গিয়ে আলো আর বচ্ছরকার উৎসবে মেতে উঠতে। স্বর্গদ্বারের ওই থিকথিকে ট্যুরিস্টের ভিড়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আশা বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের মতোই আছড়ে পড়ছে মস্তিষ্কের দেওয়ালে! আসলে এখন যে অনুভূতিটা হচ্ছে, সেটা হল 'ভয়'! যেটা আমার গোটা জীবনে আমি খুব কমই অনুভব করেছি। কিন্তু, আজ আবার ... গন্ধটা প্রকট হয়ে উঠেছে!

আমি অতি দ্রুত দু'টো করে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম। প্রায় ছুটে উঠতে শুরু করলাম ওপরে। গন্ধ-র সঙ্গে এবারে অন্য একটা শব্দও পাচ্ছি। টেনশনে, adrenaline বেশি নিঃসৃত হলে ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে যায় জানি। শব্দটা কিছু একটা ঘষার। তবে শক্ত কিছু নয়। নরম, ভারি, থসথসে কোনও ভেজা জিনিস যেন অনুসরণ করছে আমায়। পিছনে তাকাতে—কী দেখতে চেয়ে কী দেখব, সেই আশঙ্কায় একভাবে মাথা নিচু করে দৌড়ে চলেছি উপরের দিকে। আমার কিচেনের দরজার চতুষ্কোণ একটু একটু করে বড় হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আউসউইৎজ থেকে কোনও কনসানট্রেশন ক্যাম্প-এর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে পালিয়ে ছুটে চলেছি নাৎসিদের কবল থেকে দূরে। জীবনকে প্রকৃতভাবে বরণ করে নিতে। পিছনে শব্দটা এখন আরও তীব্র। আরও কাছে। কীভাবে পারলাম জানি না, তবে হাঁপাতে হাঁপাতে কিচেনের দরজা দিয়ে প্রায় এক নিপুণ লাফে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি। অজান্তেই ফ্রিজটাকেও ঠেলে দিয়েছি দরজাটাকে আটকানোর জন্যে।

আর ঠিক সেই সময়েই — 'দুম'!

যেন কিছু একটা তার সর্বশক্তি দিয়ে ওই রহস্যময় দরজার অপর প্রান্তে এসে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নাকে এলো সেই বিশ্রী গন্ধটা। এবারে বুঝতে পারছিলাম শাক-সব্জি পচা আর হাসপাতালের মর্গের গন্ধের মিশেল এটা। বমি পেয়ে গেল।

কানে এলো সেই হাড়-হিম করা ডাক। বিজাতীয় এই ডাকটায় আক্রোশের চেয়ে আর্তি ছিল বেশি। যেন কিছু একটার প্রত্যাশায় এই ভয় পাওয়ানো গলায় কান্নার সুর।

দরজা খুলে সেই ক্রন্দনরতকে সান্ত্বনা জানানোর মতো সাহস আমার নেই। স্থানুবৎ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে পেলাম দরজার ওপার থেকে বার বার আঘাত করে কোনও প্রত্যুত্তর না পেয়ে কিছু একটা ওই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। সেই ভেজা থসথসে, ভারি আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে লাগল। পিছনের পুজোমন্ডপের ঢাক কখন যেন থেমে গেছে। বাইরের রাস্তায় কয়েকটা সাইকেল রিক্সার আওয়াজ ছাড়া সব নিস্তব্ধ।

ঠিক সেই সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। বিশ্রী কড়কড় শব্দ। এটার অস্তিত্ব টের পাইনি এতক্ষণ।

দরজাটা খুলতেই ওই প্রান্তে যে মানুষটাকে দেখলাম, সে অপরিচিত। তবুও মুখটা চেনা লাগছিল। গোলগাল চেহারায় ডেনিমের টাইট শার্টটা একেবারেই মানায়নি। কাঁচা পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা খুব যত্নে ছাঁটা। সরু গোঁফ আর ধূর্ত চাহনি। কোথায় দেখেছি একে?

চিনতে পারছি না।

তবে ওর হাতে ধরা অস্ত্রটাকে বিলক্ষণ চিনি।

চেক প্রজাতন্ত্রের তৈরি, খুবই উন্নত C27 পিস্তল।

৯এম. এম বুলেট। ম্যাগাজিনে ষোলটা রাউন্ডের জায়গা আছে।

'চিনতে পারছো ব্ল্যাক অ্যারো?'

Code name-টা শুনে চমকে উঠলাম।

পেশাদার খুনির কাজটা ছেড়ে, স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে, নিজের সমস্ত পরিচয়, অতীতের সব যোগাযোগ আর সূত্রকে নিপুণ হাতে মুছে দিয়েছি আমি।

তবুও আজ কেউ আমাকে 'ব্ল্যাক অ্যারো' (কালো তীর বলে ডাকছে?

আমি দু-পা পিছিয়ে যেতেই লোকটা ড্রইংরুমে ঢুকে আসে। পিস্তলের নলটা আমার দিকে ঘোরানো। লোকটা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

'চিনতে পারছ না তো? তোমার মত celebrity প্রফেশনাল খুনিরা আমাদের মতো দালালদের মনে রাখবে কেন? সিমলা মনে পড়ে? মেহরার গেস্ট হাউস? আর তারপর সিমলা থেকে ডালহৌসি যাওয়ার পথে কাজটা?'

মনে পড়ে গেছে!

প্রায় দশ-বারো বছর আগের কথা। জি. পি. ও-র পোস্ট বক্সে টেলিফোন নম্বর লেখা একটা কাগজ রাখা ছিল মুখবন্ধ খামে।

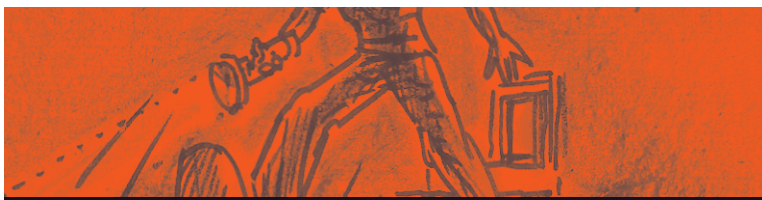

ঠিক তখনই পেলাম শব্দটা! গায়ে কাঁটা দেওয়া একটা ডাক। এ ডাক কোনও মানুষের হতে পারে না। আমার শোনা কোনও জানোয়ারের ডাকের সঙ্গেও এর মিল নেই। শব্দটা গাছগুলোর পিছন থেকে আসছে আর গন্ধটাও তীব্র হচ্ছে।

কল করতেই সুখিলাল নামে এই ছোটলোকটা ফোন ধরেছিল।

একটা 'কাজ' আছে। বড় পার্টি। ভাল টাকা। কেসটাকে অ্যাক্সিডেন্ট সাজাতে হবে। কাজের দক্ষিণা বাবদ প্রথম কিস্তির দশ লাখ Cayman Islands-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ পড়ে গেছিল। অগত্যা ডিউটির খাতিরে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় এই দালালটাকে সামনে বসিয়ে কথা বললাম। কাজটা এখানেই সারতে হবে।

রাজস্থানের কোনও এক এস্টেটের মহারাজকে খুন করতে হবে। গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে তখন উনি সিমলায়। ভিড়-ভাট্টার মধ্যে দুর্ঘটনা সাজিয়ে হত্যা করা দুরূহ, তাই মহারাজ যখন সড়কপথে নির্জন পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ডালহৌসি-ধর্মশালা যাত্রা করবেন, তখনই... । সেভাবেই হত্যার ছক কষা হয়েছিল। টাকা পয়সার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে এই দালালটার সঙ্গে তুমুল ঝামেলাও হয়েছিল আমার। খুনটা করাচ্ছিল এস্টেটের রানিমা।

এই সুখিলাল তার থেকে তিরিশ লাখ নিয়ে আমার বিশ লাখ প্রাপ্যতেও ভাগ বসাতে চাইছিল। আমি খেপে উঠেছিলাম। এতদিনের কেরিয়ারে এমন বেইমানি দেখিনি। সুখিলাল অতর্কিতে ছোট ছুরিটা চালিয়েছিল। পেটে ঢুকেছিল ওটা। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় আমি একপাশে সরে যাওয়ায় চোট-টা গুরুতর হয়নি। তবে আমার করা গুলিটা লেগেছিল ওর ডান হাঁটুর ওপরে। মুখ থুবড়ে পাহাড়ি রাস্তায় পড়েছিল সুখিলাল। আমি সরে পড়েছিলাম। মহারাজ-কেও আর মরতে হয়নি। অন্তত আমি তো মারিনি।

আজ এতবছর পর যেন অতীতের ধুলোমাখা পাতা থেকে হঠাৎ উঠে এসেছে সুখিলাল। ওর খুঁড়িয়ে হাঁটার কারণটা অনুমান করতে পারছিলাম।

যেন আমার ভাবনার রেশ ধরে সুখিলাল অসভ্যের মতো হেসে উঠে বলল—

'এবার মনে পড়েছে? আমাকে ল্যাংড়া বানিয়ে নিজে তো ভালই আছো?' অনেক খোঁজ করেছি তোমার। কিন্তু হদিস পাইনি। তারপর ভুবনেশ্বরের একটা কন্ট্যাক্ট তোমার খবর দিল।'

'তার মানে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ অনেকদিন ধরে।'

'সব ঘটনা, আর জীবনের আঙিনায় আসা সকলকে ভুলে যাওয়া যায় না ব্ল্যাক-অ্যারো। কেউ কেউ এমন কিছু করে যায়, এমন কোনও আঘাত দিয়ে যায় যেটা কোনও দিন পুরোপুরি সারে না। সারাটা জীবন খোঁচায়। জ্বালিয়ে মারে।'

ভীষণ চাপের মুখে আমার মস্তিষ্ক সবসময় ঠাণ্ডা থাকে। সেটা সুখিলালের জানার কথা নয়।

আমি অতি স্বাভাবিক ছন্দে জিজ্ঞেস করলাম—'আমার খবর কীভাবে পেলে?'

'ভুবনেশ্বরের এক পুরোন কন্ট্যাক্ট আমায় মাসখানেক আগে ফোন করে বলল—আপনার নির্দেশ মতো যাকে গত জানুয়ারিতে রাজ্য তোলপাড় করে খুঁজে চলেছে আপনার লাগানো লোকেরা— ঠিক সেরকম চেহারার একটা লোককে দেখা গেছে পুরীতে। সে নাকি ওখানে একটা পুরোনো বাড়ি নিচ্ছে দু'বছরের জন্য।'

'সেই কোন সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি।'

'কী চাই তোমার?' কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করি।

'সেটাও বলে দিতে হবে?' সুখিলালের চাপা হাসিটা আমার নজর এড়ায় না। একটু হেসে বলি, 'আপাতত সাতলাখ হলে চলবে? বাকি যা লাগবে আনিয়ে দেব।'

লোভের মশালগুলো সুখিলালের চোখে দপ করে জ্বলে ওঠে। ইশারায় জানতে চায় কোথায় রাখা আছে টাকাগুলো।

আমি কিছু না বলে ফ্রিজটা সরিয়ে ফেলি।

দেয়ালের গায়ে দরজাটা বুঝতে একটু সময় নেয় সুখিলাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে হাতলটা খুলে দিই।

'তোমার সিন্দুক নাকি ওটা? দরজা-টা তো...'

এই পর্যন্ত বলে কথা আটকে যায় ওর।

জীর্ণ পাথরে গোটা ছয়েক সিঁড়ি অন্ধকারের বুকে নেমে গেছে। ওদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আমায় টর্চ নিয়ে পথ দেখাতে বলে সুখিলাল। ভয়ানক চাপে স্নায়ু কী করে বরফ ঠাণ্ডা রাখতে হয়, পুলিশে ধরা পড়লেও কোন উপায়ে 'পলিগ্রাফ' (Lie detector) কেও ধোঁকা দেওয়া যায়, এসবের পেশাদার ট্রেনিং আমার নেওয়া আছে। কিন্তু সুখিলালের নেই। টাকার গন্ধে আর লোভের বশবর্তী হয়ে এক লাফে দরজা পেরিয়ে ওপাশের ল্যান্ডিংটায় দাঁড়ায় সুখিলাল।

আমি এত তাড়াতাড়ি সুযোগটা পাব, ভাবিনি।

বিদ্যুৎবেগে শরীরটাকে ঘুরিয়ে ওর কোমরে এক লাথি মারি। দেওয়ালের গায়ে এমন একটা দরজা আর অন্ধকারের মধ্যে জেগে থাকা ওই ভয়াবহ সিঁড়ি ওকে বিস্ময়ের ধারে কাছেও নিয়ে যেতে পারেনি। টাকার লোভ এমনই জিনিস।

সুখিলাল এটাও ভুলে গিয়েছিল ও কাকে ভয় দেখাচ্ছে।

ব্ল্যাক অ্যারো-কে! এশিয়ার প্রথম তিনজন পেশাদার কিলারের একজন যাকে অনায়াসেই বলা যায়। চরম বিপদেও যার ৯এম. এম. পিস্তলের দরকার হয় না।

লাথিটা খেয়ে সুখিলাল ষষ্ঠ সিঁড়িটাতে আছড়ে পড়েছে পিস্তল খসে পড়েছে ল্যান্ডিংয়ে। আমি ঝুঁকে পড়ে ওটা তুলে নিই। ভীষণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সুখিলাল। মাথা আর ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়েছে। হাঁটু-টা মনে হচ্ছে আবার জখম হয়েছে। ও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও পারছে না। এবার উপায় না দেখে চিৎকার করতে শুরু করে সুখিলাল।

কিন্তু রাস্তার আওয়াজ আর লাউডস্পিকার-এ গান বাজছে প্যান্ডেলে। সুখিলালের চিৎকার ওখানেই চাপা পড়ে যায়।

আমি পিস্তলটা তুলি। ওর কপালের মাঝ বরাবর তাক করি। আর ঠিক তখনই সেই জান্তব, ককর্শ ডাক আর দুর্গন্ধটা ভেসে আসে পাতালঘর থেকে। সুখিলালের চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়। ও মুখ ঘুরিয়ে নেমে যাওয়া সিঁড়ির বাঁকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক একটা সেকেন্ড যেন এক এক মিনিট লাগে। দীর্ঘ আর অসহ্য। শব্দ আর গন্ধটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সুখিলাল কিছু একটা দেখে আতঙ্কে মরণ চিৎকার করে ওঠে। আমি শব্দ শুনে বুঝতে পারি কেউ একটা ওই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। পিছিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে কান পেতে থাকি।

শব্দটা আরও কাছে এবারে। গন্ধটা তীব্রতর। বাঘ যেভাবে শিকার ধরে, ঠিক তেমনই একটা হুঙ্কার! সুখিলালের কণ্ঠে একটা এমন চিৎকার, যা মুহূর্তে বরফকেও গলিয়ে জল করে দিতে পারে।

তারপর কিছুক্ষণের জন্যে সিঁড়ির ওপাশটা স্তব্ধ। তারপর চাপা কয়েকটা শব্দ। কড় কড়ড়...ড়ড়...।

বুঝতে পারি যে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, এবারে সে ধরে ফেলেছে সুখিলালকে! আর ওর হাড়গুলোকে...

চাপা গোঙানির মতো দু-একটা শব্দ শুনতে পেলাম মনে হল। তারপর আবার সেই ভেজা, ভারি আর থসথসে কিছু একটার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ।

এবারে তার সঙ্গে বাড়তি আরও একটা ভারি জিনিসের ঘষার বিশ্রী, গায়ে কাঁটা দেওয়া আওয়াজ।

তবে কী??...

কৌতুহলকে আর দমন করতে না পেরে এক ঝটকায় দরজাটা কখন যেন খুলে ফেলেছি। হাতে জ্বলন্ত টর্চ। আর সিঁড়ির ওই প্রান্তে যা দৃশ্য দেখছি—সেটা চোখে বিশ্বাস করা যায় না!

সিঁড়িগুলি যেখানে অন্ধকারের বাঁকে হারিয়েছে, সেই বাঁকটা বরাবর সুখিলালের রক্তাক্ত দেহের কোমরের অংশটা। একটু পরেই বাঁকে হারিয়ে যাবে ওই নিকষ কালো অন্ধকারের বুকে। কেউ ওর লাশও খুঁজে পাবে না।

সুখিলালের মাথাটা আধখাওয়া মনে হল। একটা চোখ উধাও। অবশিষ্ট চোখটাতে এক বীভৎস ভয়ের চিহ্ন। যেমনটা অশোকবাবু বলেছিল! হাত দু'টো পিছনে ফেলা সুখিলালের।

আর কেউ একটা, বা কিছু একটা ওর দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে নিচে। পাতালে...। আমি নিধনযজ্ঞ থেকে রিটায়ার করলেও, প্রয়োজনে কাজটা এখানে বসে চালাতে পারি। আমার সারাজীবনের পাপ, আমার 'দোসর' হয়ে অবস্থান করছে আমারই মনের পাতালে!!

মন যেখানে বিদ্রোহ করে

রিম ঝিম মিত্র সম্প্রতি দল বেঁধে বেড়াতে গিয়েছিল ছোট্ট একটি পাহাড়ি গ্রামে। তার সেই মজার, আনন্দের, সংশয়ের, রোমাঞ্চের মুহূর্তগুলো 'সুবিধা'-র পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই কলম ধরল রিমঝিম।

আমার প্রিয় লেখক কাফকা। তাই বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান হলেই আত্মার এ্যান্টেনা পাহাড়ের দিকে ঘুরে যায়। কারণ পাহাড় আমার কাছে বইয়ের মতো লাগে। কাফকার বই-এর মতো। 'A lot is left to imagination'! নিজের মতো করে কল্পনা করতে পারি। অনুভব করতে পারি, অনেক সময় ঠিক যেমন করে চাই। আবার অনেক সময় মন বিদ্রোহ করে তার ইচ্ছেমতো আমাকে ভাবায়। রানাদা সুদেষ্ণাদি-র ওপর বেজায় চটে গিয়েছিলাম। আমাকে ফেলে শান্তিনিকেতন গেছিল এবার দোলে। তাই পরের বেড়ানোর ডেস্টিনেশন যখন পাহাড় ঠিক হল, এবারের মতো ওদের ক্ষমা করে দিলাম!

আমাদের বেড়াতে যাওয়ার একটা ছোট গ্রুপ আছে, রানাদা, সুদেষ্ণাদি, আবীর, আবীরের বউ, নন্দিনী। আমার মা, আর সুদেষ্ণাদিদের দলের চ্যাঙ ব্যাঙরা, যারা ছাড়া আমাদের যে কোনও সজ্জা incomplete। ও হ্যাঁ। আর আমি।

আমাদের এবারের পছন্দের জায়গা হল ছোটে মাংগয়া। দার্জিলিং জেলার তিস্তা বাজারের কাছে। শিলিগুড়ি থেকে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। জিপে করে তিস্তা বাজার ছাড়িয়ে উপরে উঠে সেখান থেকে আবার গাড়ি পাল্টাতে হয়, কারণ তারপরের আধঘণ্টার রাস্তাটা... যাক্ গে সে এক অ্যাডভেঞ্চার। ছোট করে বলতে গেলে দু'দিন ওই রাস্তায় যাতায়াত করলে মাসখানেকের জিম সেশন মিস করলে ক্ষতি নেই। এই লাইনটা পড়লে রানাদা গোল চোখ আরও গোল করে আমায় মারতে আসবে, কারণ এই জায়গাটা রানাদাই সিলেক্ট করেছিল। তাই এই আধঘণ্টার রোলার কোস্টার রাইডটাতে আমাদের নানা শিক্ষামূলক কথা বলে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক। যেমন 'ওই দ্যাখ! ওই লাল ফুলটা দেখছিস, ওটাকে বলে জবা!' এরকম নানা 'অজানা' তথ্যে শিক্ষিত হতে হতে অবশেষে পৌঁছলাম ছোটে মাংগয়া।

ছোট থেকে বেশ কয়েকটা পাহাড়ি জায়গায় ঘুরতে গেছি।

রিমঝিম ও নন্দিনী মনাস্ট্রির বারান্দায়, আকাশের মাঝে

সেই সব জায়গা থেকে এই জায়গাটি আলাদা বললে একটু না, বেশ অনেকটাই কম বলা হবে। প্রত্যেকটি ঘুরতে যাওয়া জায়গার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু ছোটে মাংগয়াকে ঠিক 'ঘুরতে' যাওয়ার জায়গা বলে লেবেল করতে চাই না। এটা আমার কাছে অনেকটা নিজেকে রিডিস্কভার করার জায়গা বলে মনে হয়েছে। আমার মনে হয় শুধু আমার না, বাকিদেরও সেরকমই লেগেছে। অনেক প্ল্যান করা ছবির কাজের অনেক মুহূর্ত improvised হল। খুব spantaneously হয়তো মুহূর্তগুলো লুকিয়ে ছিল রানাদা সুদেষ্ণাদির মনে। সেই কারণেই বলা 'রিডিস্কভার'।

যেখানে ছিলাম তার মালিক প্রধানজি। খুবই মিষ্টি মানুষ। থাকার জন্য আছে পাঁচটি ঘর। অনেকটা cottage ধরণের। আমাদের বাহিনী পাঁচটি ঘরই দখল করে নিল। অতএব, 'পার্টি শুরু কিয়া যায়।' তবে এই 'পার্টি'র ধরণটা একটু অন্য রকমের। এখানে হোস্ট পাহাড় আর প্রচুর মেঘ, একেকজন একেক মুডের। এদের আকাশকেলী হার মানিয়ে দেবে যে কোনও আন্তর্জাতিক water ballet dancer কে আর এই নাচের একমাত্র দর্শক আমরা। এই ফিলিংটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করা যাক। আমাদের ঘরগুলো ছিল তিনকোনা কেকের টুকরোর একটা কোণের ওপর। গভীর খাদের মলাট। সকালে আমাদের ব্যালে পারফর্মাররা একটু বিশ্রামে থাকলে দেখা যেত তিন ধারের পাহাড়, এক ধারে কালিম্পং, এক ধারে সিকিম, আর অন্য দিকে পাহাড়ি পথ— দূরে তিস্তা। রোজ রাতে পাহাড়ে যে কার বিয়ে হয় কে জানে, রাত হলেই পাহাড়ের দল সেজে ওঠে টুনি বালবের মালায়!

সব পাহাড়ের গায়েই যেটা থাকে, এখানেও ছিল, 'suicide point'। কিন্তু সুদেষ্ণাদির মধুর কণ্ঠস্বরে চিৎকারের ভয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে হিন্দি সিনেমার নায়িকা কল্পনা করার ইচ্ছেটা বর্জন করতে হল।

আমরা ওখানে ছিলাম মেরে কেটে দু'দিন, এটাই দুঃখ। তার মধ্যে একদিন যাওয়া হল একটি মনাস্ট্রিতে। পায়ে হেঁটে (মানে শহুরে লোকের পায়ে) প্রায় ৪০ মিনিট। চড়াই রাস্তা। সবাইকে পেছনে ফেলে মনাস্ট্রিতে পৌঁছনোর দৌড়ে কে প্রথম হল? দলের সব চেয়ে সিনিয়র সদস্য সুদেষ্ণা রায়। বেশ সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির। ছোট্ট, ছিমছাম, আমি আর বিশ্ব কুঁড়ে আবীর নিয়মের ধার না ধরে সবার পিছনে বসার জন্য পাতা গদিতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম! নন্দিনীও কম যায় না, গড় হয়ে প্রণাম করার ভান করে সেও খানিক গড়িয়ে নিল! বৌদ্ধ মন্দির থেকে আরও কয়েক ধাপ উপরে উঠে দেখলাম দারুণ সুন্দর। ওই একই বৌদ্ধ মন্দিরের একটা বাড়তি অংশ। ওখানে খোলা ছাদের মতো জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চারিদিকের সৌন্দর্য দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে রবীন্দ্রনাথের বোন বলে কল্পনা করে নিলাম। তবে দায়িত্ব ভুললে চলবে না বন্ধু, sincere tourist এর মতো সবাই বিভিন্ন ভঙ্গীতে ছবিও তুললাম!

পাহাড়ি রান্না খেতে খুব মজার লাগে, অদ্ভুৎ simple অথচ দারুণ স্বাদু। প্রধানজির স্ত্রী এবং দু-একজন কর্মচারী খুব যত্নে রেঁধে খাওয়াতেন আমাদের। স্পেশাল হল, ছোট বোমা 'ডাল্লে'। ত্রিভুবন ভোলানো ঝাল, ছোট্টো ছোট্টো গোল গোল লাল লাল লঙ্কা।

শেষ রাতে পাহাড় মেঘের যৌথ প্রয়াসে আমাদের সবার উদ্ভাবনী সত্ত্বা উপচে বেরিয়ে এল। আমরাই শ্রেষ্ঠ creative group এই বিশ্বাস যখন আমাদের চূড়ান্ত লেভেলে সবে পৌঁছতে যাবে, মাথায় চাঁটি মেরে নামল বৃষ্টি। অগত্যা, ঘরের ভেতর।

পাহাড়ে যাব অথচ ভূতের গল্প হবে না? সম্ভব নাকি? রানাদার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ভোর রাত পর্যন্ত চলল সবার 'of

মনাস্ট্রির পথে রণক্লান্ত রিমঝিম, নন্দিনীকে পাহারা দিচ্ছে আবীর ও সুমন

the other world'-এর গল্প।

শেষ সকালে সবাই সেজেগুজে তৈরি। বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি। ফেরার দিন বোধহয় আমাদের সাজটা একটু বেড়ে যায়, পাহাড় ছেড়ে চলে আসার দুঃখটা খানিকটা ভোলার প্রয়াসে। প্রধানজি এবং বাকিদের কাছ থেকে প্রত্যেকে উপহার পেলাম। ওখানকার typical designer ছোট্টো ছোট্টো উত্তরীয় বা স্কার্ফ এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলাম যে আবার আসব, খুব শিগ্গির। তবে আমরা প্রত্যেকে পাহাড়ের যত বড় ভক্তই হই না কেন, সব থেকে বড় ভক্ত বুঝলাম রানাদা, কারণ ফেরার পথে অনেকটা রাস্তা চলে আসার পর দেখা গেল, আমাদের প্রিয় Chhote Mangwar ঘরের চাবি রয়ে গেছে রানাদার পকেটে।

ছবি : অরিজিৎ দত্ত

কথা ও কাহিনি

টিম সিলেকশন

রূপক সাহা

বাবাইয়ের কোচিং ক্যাম্পে পৌঁছে সুলেখা দেখল, তখনও নেট প্র্যাকটিস শেষ হয়নি। যাক বাবা, ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টোটা বোস কোচিং ক্যাম্পের ছেলেরা বেঙ্গালুরুতে কী যেন একটা টুর্নামেন্ট খেলতে যবে। আজই টিমের ফাইনাল সিলেকশন। বাবাই চান্স পাবে কী না, দু'দিন ধরে সেই চিন্তাই সুলেখার মাথায় ঘুরছে। ক্যাম্পে প্রায় শ'খানেক ছেলে প্র্যাকটিস করে। তাদের মধ্যে কুড়ি জন বাছাই হয়ে গিয়েছে। বাবাই এখনও টিকে আছে। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে যাবে ষোলোজনের দল। ভগবানকে ডাকতে ডাকতে সুলেখা ময়দানে এসেছে। যেন ছেলের নামটা শেষ লিস্টে থাকে।

শীতের বিকেল। বেলা সাড়ে চারটের পর থেকেই ময়দানে আলো কমতে থাকে ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলে সুলেখা তাড়াতাড়ি ক্লাবের গেটের দিকে হাঁটতে লাগল। দূর থেকেই ও দেখল, ক্লাবের নোটিস বোর্ডের কাছে মায়েরা ঘোরাঘুরি করছে। ওর বুকটা একবার ধক করে উঠল। টোটাদা নিশ্চয়ই টিম লিস্ট টাঙিয়ে দিয়েছে। ভাবতেই সুলেখা একটু নার্ভাস হয়ে গেল। বাবাই বাদ পড়লে অন্যদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। অ্যাপার্টমেন্টের লোকেরা সবাই জানে, বাবাই টোটা বোসের ক্যাম্পে প্র্যাকটিস করে। প্রায়ই ফ্ল্যাটের লোকেরা ওদের দুজনকে কোচিং ক্যাম্প থেকে ফিরতে দেখে। বাবাইয়ের কাঁধে তখন ঝোলে বিরাট কিট ব্যাগ। কোচিং ক্যাম্পের ছেলেরা যে বেঙ্গালুরুতে খেলতে যাচ্ছে, খবরের কাগজে তা বোধহয় বেরিয়েছিল। তারপর থেকে অ্যাপার্টমেন্টের অনেকেই জিজ্ঞেস করছে, 'কী বাবাই চান্স পেল?' সুলেখার নিজের ননদ স্বপ্না খেলার খুব খবর-টবর রাখে। কেননা, ওর ছেলে টিঙ্কু ফুটবল খেলে। আজ সকালেই স্বপ্না ফোন করেছিল, 'বউদি, বাবাই কবে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে গো? গেলে ওকে কিন্তু একটা জিনিস আনতে দেব।'

সুনন্দ অনেক চেষ্টা করে, এই কোচিং ক্যাম্পে ঢোকাতে পেরেছিল বাবাইকে। ক্যাম্পের কোচ টোটা বোস, একটা সময় খুব নামকরা ক্রিকেটার ছিলেন। ওঁর একটা ভাল নাম আছে সেটা সুলেখা জানে না। ভদ্রলোক বেঙ্গল তো খেলেইছেন। একবার নাকি ইন্ডিয়া টিমের ট্রায়ালেও ডাক পেয়েছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, এখনও খুব হ্যান্ডসাম। সুনন্দর এক কলিগ শোভন এই টোটা বোসের দূর সম্পর্কের ভাই। বাড়িতে আড্ডা মারতে এসে, বাবাইয়ের ক্রিকেট প্রীতি দেখে, শোভনই পরামর্শটা দিয়েছিল, 'টোটাদার ক্যাম্পে বাবাইকে ভর্তি করে দেরে সুনন্দ। মাসে মাত্র পাঁচশো টাকা করে ফি। টোটাদার ক্যাম্পে ঢুকতে পারলে দেখবি, বাবাই খুব অল্প দিনের মধ্যে বেঙ্গল খেলবে।'

খেলতে দেওয়ার ব্যাপারে সুলেখার যে খুব মত ছিল, তা নয়। বাবাই তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। সেন্ট্রাল পয়েন্টের মতো স্কুলে। এমনিতেই পড়ার খুব চাপ। ও খেলার চাপটাও নিতে পারবে কী না, তখন সুলেখা বুঝতে পারছিল না। তা ছাড়া, ছেলেকে সুলেখা খুব চোখে চোখে রাখে। অ্যাপার্টমেন্টের কারও সঙ্গে তেমন মিশতে দেয় না। কোচিং ক্যাম্পে বাবাই কাদের পাল্লায় গিয়ে পড়বে, তা নিয়েও ধন্ধে ছিল। কিন্তু শোভনই ওর দ্বিধা কাটিয়ে দেয়। বলে, 'ওই ক্যাম্পে যারা খেলা শেখে, প্রত্যেকেই তারা নামি দামি স্কুলে পড়ে। একবার গেলেই বউদি সেটা বুঝতে পারবেন। টোটাদা ফালতু ফ্যামিলির ছেলেদের অ্যালাউ করে না। পেডিগ্রি দেখে তবে ক্যাম্পে ভর্তি নেয়।'

শোভন বাড়িয়ে কিছু বলেনি। বাবাইয়ের পড়াশুনোয় যাতে অসুবিধে না হয়, সে জন্য টোটাদাকে বলে ও, শনি-রবিবার প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। প্রথম দিন ক্যাম্পে এসে ওর আর সুনন্দর বেশ ভালই লেগেছিল। ক্লাবের সামনে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নেট প্র্যাকটিস শেষ করেই ছেলেরা হয় বাবা, না হয় মায়ের সঙ্গে গাড়িতে করে চলে যাচ্ছে। পার্কিং স্পটে ওদের অফিসের গাড়ি দেখে, সুনন্দ সেদিনই আবিষ্কার করেছিল, ওদের কোম্পানির এক ভাইস প্রেসিডেন্টের ছেলেও টোটাদার ক্যাম্পে প্র্যাকটিস করে। ব্যস, তারপর থেকে ওর উৎসাহ বেড়ে গিয়েছে। প্রতি শনি-রবিবার বাবাইকে ও ক্যাম্পে নামিয়ে দিয়ে যায়। সুলেখা গিয়ে নিয়ে আসে।

দূর থেকে সুলেখা দেখল অভিষেক, অরিত্র, হিন্দোল, প্রাভজ্যোৎ আর কৃষ্ণেন্দুর মা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। ওদের কোনও চিন্তা নেই। ওদের ছেলেরা চান্স পাবেই। গত বছর ক্যাম্পের ছেলেদের হায়দরাবাদে নিয়ে গিয়েছিলেন টোটাদা। অভিষেকরা সবাই সেই টিমে ছিল। টিম চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরেছিল। কাগজে খুব বড় করে সেই খবর বেরিয়েছিল। ক্যাম্পে বাবাই তখন নতুন। ফলে সুলেখা জানত, টিমে বাবাই ঢুকতে পারবে না। ওর মনে কোনও আক্ষেপও ছিল না। কিন্তু এবার স্কুল আর ক্যাম্পের নানা টুর্নামেন্টে বাবাই ভাল রান করেছে। দুটো সেঞ্চুরিও। এমনিতেই ওর চান্স পাওয়া উচিত। কিন্তু ক্যাম্পে বছর দেড়েক আসার সুবাদে সুলেখা একটা জিনিস বুঝতে পেরেছে, ভাল খেলাটাই যথেষ্ট নয়। অনেক ধরাধরির ব্যাপার আছে। না হলে টিমে ঢোকা যায় না।

কথাটা মনে হতেই সুলেখার পা ভারী হয়ে এল। শরীর আর নোটিস বোর্ডের দিকে এগোতেই চাইছে না। এর আগে, জীবনে আর একবারই ও এই রকম টেনশনে পড়েছিল। ক্লাস ফাইভে বাবাইকে সেন্ট্রাল পয়েন্ট স্কুলে ভর্তি করার সময়। ওর সঙ্গেই অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছিল ননদের ছেলে টিঙ্কু। উফ, বাবাই পরীক্ষা দিয়ে আসার পর, সেই রাত্তিরটা যেন কাটতেই চায়নি।

ESSO

সারা রাত সুলেখা ভগবানকে ডেকেছিল, এমন যেন না হয়... টিঙ্কু ভর্তি হয়ে গেল, অথচ লিস্টে বাবাইয়ের নাম নেই। ভগবান অবশ্য ওর প্রার্থনা শুনেছিলেন। লিস্টে প্রথম নামটাই অভিমন্যু ভট্টাচার্যের। অর্থাৎ কী না বাবাইয়ের। কিন্তু আজ কি সে রকম কিছু হবে? ভাবতে ভাবতে ও এসে দাঁড়াল জটলার কাছে। তাকিয়ে দেখল, না নোটিস বোর্ডে টোটাদা লিস্ট টাঙাননি।

'কী রে মারুতি, আজ এত দেরিতে?'

প্রশ্নটা শুনে সুলেখা ঘুরে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে হেনা বক্সি। ওর ছেলে কল্যাণ টিমের উইকেট কিপার। ছেলেটা খুব ভাল খেলে। সবাই জানে, আর কিছুদিনের মধ্যেই কল্যাণ জুনিয়র বেঙ্গল টিমে খেলবে। হেনার মুখে তাই টেনশনের কোনও ছাপ নেই। হেনা বিরাটির কোনও এক কলেজে পড়ায়। কিন্তু কথাবার্তা শুনলে বোঝা যায় না ও টিচার। ভীষণ মুখ খারাপ। কথায় কথায় সেক্সি জোকস বলে। বাব্বা, ও সব মনে রাখতেও পারে। মায়েদের আড্ডায় এক একসময় এমন সব কথা বলে, কানে আঙুল দিতে হয়। হেনা ক্যাম্পের এক একজনের অদ্ভুত নাম দিয়েছে। সুলেখা মারুতি এইট হান্ড্রেডে আসে বলে, হেনা ওকে মারুতি বলে ডাকে। প্রথম প্রথম সুলেখার ভাল লাগত না। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে, হেনা অন্যদের মতো কুঁচুটে স্বভাবের নয়। ও মুখে যা, অন্তরেও তা।

সুলেখা বলল, 'পার্ক স্ট্রিটে আটকে গেছিলাম রে। কখন লিস্ট টাঙাবে বল তো টোটাদা? বাবাইয়ের জন্য আমার খুব টেনশন হচ্ছে।'

হেনা বলল, 'দাঁড়া এত তাড়াতাড়ি কি আর টাঙাবে? ধরাধরি, দর কষাকষি, শোওয়া-শোওয়ি, কত কী হবে। তার পর টাঙাবে।'

'দর কষাকষি' কথাটা শুনে সুলেখা দমে গেল। ব্যাঙ্গালোর ট্রিপের জন্য প্রত্যেক ছেলের কাছ থেকে দশ হাজার করে টাকা চেয়েছিলেন টোটা বোস। ধনতেরাসের সময় হিরের নাকছাবি কিনবে বলে, সুলেখা দশ হাজার টাকা আলাদা করে জমিয়ে রেখেছিল। এ বার আর কেনা হবে না। পুরো টাকাটাই ও আজ নিয়ে এসেছে। বাবাই সিলেক্টেড হলে, টাকাটা ও দিয়ে যাবে। কিন্তু হেনা দর কষাকষির কথা বলছে। তার মানে, দশ হাজারেরও বেশি কেউ দিচ্ছে। মনে মনে প্রমাদ গুনল সুলেখা। যে যত বেশি টাকা দেবে, তার ছেলে চান্স পাবে, এমনটা যদি হয়, তা হলে বাবাইয়ের টিমে ঢোকা অসম্ভব। সুলেখা জানে, ক্যাম্পে এমন অনেক ছেলে আছে, যাদের বাবা-মায়েরা লাখ টাকাও দিতে পারে। সবাইয়ের কাছেই এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার।

কে বেশি টাকা দিচ্ছে? প্রশ্নটা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শুনে হেনা বলল, 'আমার কাছে সব খবর পাবি মারুতি। মেরিট অনুযায়ী কি আর সিলেকশন হয়? মোটেই তা নয়। এক থেকে বারো নম্বর... হয়তো মেরিটে আসবে। বাকি চারজন ঢুকবে পিছন দরজা দিয়ে। সব জায়গায় এটাই হয়। টোটা বোসের ক্যাম্প থেকে ইন্ডিয়া টিম সিলেকশন—সর্বত্র। দেখবি, অরিঞ্জয় বলে ছেলেটা এবার টিমে ঢুকে যাবে। ওর বাবা লাখ টাকার স্পনসরশিপ এনে দিয়েছে ক্যাম্পে। ওকে বাদ দিয়ে টিম কখনও ব্যাঙ্গালোরে যাবে? কক্ষনো না।'

সুলেখা কাঁপা গলায় বলল, 'আমার ছেলেটার কী হবে রে হেনা? দু'তিন ধরে প্র্যাকটিসে এসে নানারকম কথা শুনছে। খুব দমে গেছে রে। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়াও করছে না। কাল রাতে খেতে বসে আমায় কী বলল জানিস? এ বার টিমে চান্স না পেলে আর ক্যাম্পেই যাবে না। টোটা স্যারের বাড়িতে তুমি একবার যাও মা। তুমি রিকোয়েস্ট করলে স্যার না বলতে পারবে না। কিংশুকের মা তো মাঝে মাঝেই স্যারের কাছে যায়। আমার থেকেও ও খারাপ ব্যাটসম্যান। তবুও বাদ পড়ে না।'

'গুড সাজেশন।' মিচকে হাসি হেনার মুখে। বলল, 'ছেলে যখন বলছে, তখন ফেরার পথে একবার না হয় যা বেচারার বউ নেই। তুই গেলে টোটা বোসের সময়টা ভাল কাটবে। হ্যাঁ, গেলে কিন্তু সন্ধের মুখে যাস। তারপর কিন্তু লোকটা মৌতাতে বসে।'

'তোর মাথা খারাপ।' বলেই চুপ করে গেল সুলেখা। একটু দুরেই এসে দাঁড়িয়েছে পৃথুলা পয়মন্তী। কিংশুকের মা। মুখে চড়া মেক আপ। কপালে বড় একটা টিপ। পরনে হলুদ রঙের সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়ি। স্লিভলেস ব্লাউজ, পরিষ্কার ক্লিভেজ দেখা যাচ্ছে। হেনার কাছেই সুলেখা শুনেছে, পয়মন্তী নাকি প্রায়ই যায়, টোটা বোসের ফ্ল্যাটে। দুজনে বসে ড্রিঙ্ক করে। তার পর কী করে, সেই রোমাঞ্চকর গল্পও হেনা করেছে। গল্পটা ও শেষ করেছে এই বলে যে, 'ওই ধুমসো হাতিটার মধ্যে টোটা বোস কী পায়, কে জানে?' পয়মন্তীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে, নিজের ছিপছিপে শরীরের দিকে একবার তাকাল সুলেখা। ওরও আজ মনে হল, সত্যিই পয়মন্তীর কাছে কী পায় টোটাদা, কে জানে?

> তোমাদের মতো মিডল ক্লাস ফ্যামিলির লোকেরা সবই পারে। আমি তো তোমার ছেলের নামে রিটন কমপ্লেন করব ঠিক করেছি। ওকে যাতে আর ক্যাম্পে রাখা না হয়।

মাঠে পরপর টাঙানো তিনটে নেট। সুলেখা দেখল, মাঝের নেট থেকে বেরিয়ে আসছে বাবাই। এতক্ষণ ও খেয়ালই করেনি, বাবাই বোলিং করছিল। সাদা পোশাকে ওকে ক্রিকেটারের মতোই লাগছে। ক্লাস নাইনে পড়ে, বয়স পনেরো পেরিয়েছে হাইট এখনই পাঁচ ফুট ছয়। বাবার মতোই লম্বা হবে। অরিত্রর সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল। ফেন্সিংয়ের কাছে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বাবাই মুখটা কঠিন করে ফেলল। রাগ তা হলে পড়েনি ছেলের। বাড়ি থেকে আজ বেরনোর সময় টিফিন বক্সটাও নিয়ে আসেনি। স্রেফ রাগ দেখানোর জন্যই। ভেবে সুলেখা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্যদিন বাবাই নেট থেকে বেরিয়ে দু'একটা কথা বলে, তারপর ড্রেস বদলাতে যায়। আজ পাশ দিয়ে চলে গেল, অথচ ফিরেও তাকাল না।

'তোমার ছেলেটা কী ইডিয়েট বলো তো সুলেখা। দিল তো আমার ছেলেটার সর্বনাশ করে?'

শুনে ঘুরে তাকাল সুলেখা। হিন্দোলের মা, একেবারে তেড়িয়া মেজাজে। সুলেখা বুঝতেই পারল না, বাবাই কী করেছে।

ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে উপাদি?'

'ন্যাকা ষষ্ঠী। কিচ্ছু শোনোনি, না? হিন্দোলের দুটো আঙুল থেঁতলে দিয়েছে তোমার গুণধর ছেলে। নেটে তখন বল ছুঁড়ছিল। এমন জোরে ছুঁড়েছে, বল স্ট্রেট হিন্দোলের আঙুলে। কান্তিদা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এক্স রে করে ডাক্তার বলেছে, এক মাস না কী খেলতে পারবে না। হিন্দোল আমায় বলল, মা অভিমন্যু ইচ্ছে করেই আমাকে ইনজিয়র্ড করল। আমি আউট হয়ে গেলে, ওর চান্স পাওয়া ইজি হয়ে যাবে। ছেলেকে কি তুমিই শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছ, সুলেখা? ছিঃ।'

দূরে দাঁড়িয়ে অভিষেক, কৃষ্ণেন্দু, অরিত্রর মায়েরা ওর হেনস্থা দেখে মজা পাচ্ছে। সম্ভবত, ওরাই ঠেলে উপাদিকে পাঠিয়েছে। এই দলটাই মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিল, যেদিন বাবাই প্রথম সেঞ্চুরিটা করে। হেনা ছাড়া আর কেউই সেদিন বাবাইয়ের পিঠে হাত বোলায়নি। আজ 'ছিঃ' শব্দটা শুনে সুলেখা চমকে উঠে বলল, 'এ আপনি কী বলছেন উপাদি? ইচ্ছে করে কি কেউ কাউকে ইনজিয়র্ড করতে পারে?'

'পারে। তোমাদের মতো মিডল ক্লাস ফ্যামিলির লোকেরা সবই পারে। আমি তো তোমার ছেলের নামে রিটন কমপ্লেন করব ঠিক করেছি। ওকে যাতে আর ক্যাম্পে রাখা না হয়। মিঃ বোস আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছেন বলে, বেঁচে গেলে। কিন্তু বলে রাখছি, আমার ছেলে যদি সত্যিই ব্যাঙ্গালোরে যেতে না পারে, তা হলে আমিও দেখব, অভিমন্যু কী করে যায়। দরকার পড়লে প্রেসের লোকদের কাছেও আমি সব খুলে বলব।'

বাবাই মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ায় এমনিতেই সুলেখা মুষড়ে ছিল। তার উপর কড়া কড়া কথা শুনে, অপমানে ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। কোনও উত্তরই দিতে পারল না। পাশ দিয়ে ওর মায়ের সঙ্গে তাঁবুতে ঢুকতে যাচ্ছিল, টিমের ক্যাপ্টেন অভিষেক। উপাদির ধমকানি শুনে ও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'তুমি এ সব কী বলছ আন্টি? ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। প্র্যাকটিসে হতেই পারে। আমি তখন পাশের নেটে ব্যাট করছিলাম। আমি দেখেছি, অভিমন্যু ইচ্ছে করে ইনজিয়র্ড করেনি। হিন্দোল তখন ফালতু ওকে অ্যাকিউজ করল।'

শুনে অভিষেকের মা বলল, 'এই তোর পাকামো মারার কী দরকার রে? ওদের ব্যাপার, তুই নাক গলাচ্ছিস কেন?'

গজগজ করতে করতে উপাদি পার্কিং স্পটের দিকে চলে যাচ্ছে। অন্য মায়েরা ছেলেদের নিয়ে একে একে বেরিয়ে গেল। ক্লাবের মালিরাও নেট গুটিয়ে ফিরে আসছে। ময়দানে আঁধার নেমে এসেছে। তাঁবুর ভিতর আলো জ্বলে উঠল। বাবাই এখনও আসছে না কেন, সুলেখা বুঝে উঠতে পারল না। ফেন্সিংয়ের ধারে বোধশূন্যহীন চোখে দাঁড়িয়ে রইল ও। চোখের জল শুকিয়ে যাওয়ার পর ও দেখল, কাঁধে বড় কিট ব্যাগটা ঝুলিয়ে বাবাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে। কাঁধটা সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। স্পষ্টতই ক্লান্তির লক্ষণ। ওর দিকে না তাকিয়ে বাবাই পার্কিং স্পটের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেকে দেখে সুলেখার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল।

গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই সুলেখার রাগ হল সুনন্দর উপর। কাল রাতে বাবাই একবার বলেছিল, 'বাবা, শোভনকাকুকে তুমি একবার রিকোয়েস্ট করবে, যাতে আমাকে টিমে নেওয়ার কথা স্যারকে বলে।' সুনন্দ তখন টিভিতে খবর শোনায় ব্যস্ত। বার দুয়েক কথাটা শুনে বিরক্ত হয়ে তখন ও উত্তর দিয়েছিল, 'আমি কাউকে রিকোয়েস্ট করতে পারব না। যোগ্যতা দেখিয়ে টিমে যাতে সিলেকশন পাও, তার চেষ্টা করো।' অভিমানে বাবাই তখন উঠে গিয়েছিল। সুনন্দ লক্ষ্যও করেনি, নিজের ঘরে ঢুকে বাবাই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। রাতে এ নিয়ে সুনন্দর সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হয়। শেষে সুলেখা রাগের মাথায় বলে ফেলেছিল, 'ঠিক আছে, তুমি যখন পারবে না-ই বলছ, তখন আমিই না হয় চেষ্টা করে দেখি।' কিন্তু চেষ্টাটা কীভাবে করবে, সুলেখা নিজেও ভাবেনি।

গাড়িতে উঠে গম্ভীর মুখে বাবাই সামনের সিটে বসেছে। পিছনে সুলেখা দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। চেষ্টা ওকে করতেই হবে। সেইসঙ্গে একটা শিক্ষা দিতে হবে উপাদিকেও। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ জ্বলতে লাগল। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে গাড়ি পৌঁছনোর পর সুলেখা সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলল। কাছেই, সাদার্ন অ্যাভেনিউর মোড়ে টোটা বোসের ফ্ল্যাট। সুলেখার মনে পড়ল, হেনা সন্ধের মুখে যেতে বলেছিল। এই সময়টায় টোটা বোস নাকি একা থাকেন। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে, সুলেখা নেমে পড়ল। ছেলেকে কিছু না বলে ও হাঁটতে লাগল, সাদার্ন অ্যাভেনিউর দিকে।

চিন্তামুক্ত যৌনজীবন

চিন্তামুক্ত যৌনজীবনযাপনের জন্য বিশ্বজুড়েই বাড়ছে এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপশন-এর চাহিদা। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এছাড়াও এর চাহিদার অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে ধর্ষিত হওয়া কিংবা জোর করে সহবাসে বাধ্য করার মতো দুর্ঘটনা। এই এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপশন বা সংক্ষেপে ই সি আসলে কী? কীভাবেই বা কাজ করে? এর কি কোনও সাইড এফেক্টস আছে? ব্রেস্ট ফিড করানো মহিলারা কি এটা ব্যবহার করতে পারেন? ইসি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন নাইটিঙ্গেল হাসপাতালের বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ পুরুষোত্তম শাহ।**

এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপশন বা ইসি আসলে কী

এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপশন হল অবাঞ্ছিত কিংবা অপরিকল্পিত গর্ভরোধ করার একটা পদ্ধতি। অসাবধানতাবশত যৌনমিলনের পর সন্তান ধারণ করার চিন্তা থেকে মুক্ত হতে এখন ইসি সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। একে মর্নিং আফটার পিলও বলা হয়। পদ্ধতিটি খুবই নিরাপদ এবং কার্যকর।

ইসি কখন ব্যবহার করা দরকার

কন্ট্রাসেপটিভ পদ্ধতি যদি কোনও কারণে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ কেউ পিল খেতে ভুলে গেলে কিংবা কন্ডোম ছিঁড়ে গেলে, এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপশন ব্যবহার করা দরকার। আবার কেউ যৌনমিলনে বাধ্য হলে কিংবা ধর্ষিত হলেও দরকার হয় এই পদ্ধতির। সবচেয়ে ভাল হয় যৌন মিলনের পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে এই পিল খেলে। অবশ্য ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে। এরপর ইসি পিল খেলে আর কোনও কাজ হবে না।

সমীক্ষায় জানা গিয়েছে অসাবধানতাবশত যৌনমিলনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই পিল খেলে যেখানে সাফল্যের হার ৯৫% সেখানে ২৫-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাফল্যের হার ৮৫% এবং ৪৯-৭২ ঘণ্টার মধ্যে হলে হার দাঁড়ায় মাত্র ৫৮%। কিন্তু ইসি পিল খাওয়ার পরও যদি পরবর্তী পিরিয়ড নির্ধারিত দিন থেকে ১ সপ্তাহের বেশি পিছিয়ে যায় তাহলে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার। কারণ এক্ষেত্রে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

কীভাবে কাজ করে

মনে রাখতে হবে, ইসি কখনওই অ্যাবরশন বা গর্ভপাত ঘটায় না। এটা প্রেগনান্সি প্রতিরোধ করে। তিনটে উপায়ে কাজ করে এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল।

- ডিম্ব নিঃসরণ বা ওভিউলেশনকে পিছিয়ে দেয়
- শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে বাধার সৃষ্টি করে
- যদি শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন হয়ও, তাহলেও তা জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের পথ আটকে দেয়। কারণ জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম্বাণু যাওয়া মানেই প্রেগনান্ট হওয়া। আর শারীরিক মিলনের পর ৩ দিনের মধ্যে সাধারণত এই ডিম্বাণু জরায়ুতে যায়। ঠিক এই কারণেই ৭২ ঘণ্টা পর এই পিল খেলে কোনও কাজ হয় না।

কাদের জন্য উপযুক্ত

সন্তান ধারণে সক্ষম এমন যে কোনও মহিলা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই যদি তাঁরা সন্তান না চান কিংবা গর্ভসঞ্চার আটকাতে চান। যদিও এটা নিয়মিত ব্যবহার করা ঠিক নয়।

কারা এটা ব্যবহার করবেন না

যদি কেউ ইতিমধ্যেই গর্ভবতী হয়ে থাকেন তাহলে ইসি ব্যবহার করা উচিত নয়। এছাড়া কিছু কিছু শারীরিক সমস্যা থাকলেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে সমস্যা হতে পারে।

কী থাকে এই ইসি পিল-এ

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল-এ থাকত এথিনিল ইস্ট্রাডিওল (ETHINYL ESTRADIOL) এবং লিভোনরজেসস্ট্রিল (LEVONORGESTREL) হরমোন। এই

পিল অসতর্ক মিলনের পর প্রথম ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ২টো এবং এরপর ১২ ঘণ্টা অন্তর আরও দুটো খেতে হত। আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি পিল-এ থাকে একটাই হরমোন—লিভোনরজেসস্ট্রিল (LEVONORGESTREL) পুরো ডোজ ১.৫ মি. গ্রা-র। কোনও কোনও কোম্পানির তৈরি বড়িতে এই হরমোন থাকে ০.৭৫ মি. গ্রা করে। অসতর্ক যৌন মিলনের পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খেতে বলা হয়। প্রথম ডোজের ১২ ঘণ্টা পর খেতে বলা হয় দ্বিতীয় ডোজ। এর সমস্যা হল, দ্বিতীয় ডোজ খেতে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা। তাই বেশ কিছু কোম্পানি ১.৫ মি. গ্রা হরমোন দিয়েই ট্যাবলেট বানাচ্ছেন। এই ট্যাবলেট একটা খেলেই কাজ হয়।

সাইড এফেক্টস কিংবা ঝুঁকি থাকতে পারে কি

সাধারণ ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেলে যে সমস্ত ছোটোখাটো সমস্যা হয়, তেমন কিছু হলেও হতে পারে। যেমন মাথার যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব কিংবা বমি হওয়া। কারও কারও তলপেটে ব্যথা কিংবা ব্রেস্টটা ভারি লাগতে পারে। তবে যা-ই হোক বা না হোক তা দু'দিনের বেশি স্থায়ী হয় না কখনওই।

যদিও কিছু কিছু শারীরিক সমস্যা থাকলে এই পিল না খাওয়াই ভাল সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে কোনও ঝুঁকির আশঙ্কা থাকে না।

নিয়মিত ব্যবহার করা যায় কি

কখনওই নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি হিসেবে নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত নয়। একমাত্র অসতর্ক সহবাসের পর কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যর্থ হলেই এর প্রয়োগ দরকার। বারবার ব্যবহারে পিরিয়ডের সমস্যা এবং স্বল্পস্থায়ী সাইড এফেক্টসগুলো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

কী করে বোঝা যাবে ইসি ঠিকমতো কাজ করছে

একবার এই বড়ি খেয়ে পরবর্তী পিরিয়ডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সেই সময়ের থেকে ৭ দিন পরও যদি পিরিয়ড শুরু না হয় তাহলে প্রেগনান্সি টেস্ট করাতে হবে। যোগাযোগ করতে হবে চিকিৎসকের সঙ্গেও।

এটি কি সত্যিই নিরাপদ

এমারজেন্সি কন্ট্রাসেপশন খুবই নিরাপদ এমনকী এটি ব্যবহার করতে পারেন ব্রেস্ট ফিড করানো মায়েরাও। তবে কখনওই বারবার এর প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। এছাড়াও এটি কেবলমাত্র গর্ভরোধ করে, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কিংবা এড্স্ প্রতিরোধ করে না।

আপনাদের প্রশ্ন থাকলে লিখে পাঠাতে পারেন। খামের উপর 'ডাক্তারের চেম্বার' লিখে দেবেন।

ঠিকানা : সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি ; কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagpha@vsnl.com

অথবা যোগাযোগ করতে পারেন
ডঃ পুরুষোত্তম শাহ
গাইনোকলজিস্ট ও ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট
নাইটিঙ্গেল হসপিটাল, ১১, শেক্সপিয়র সরণি,
কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন : ৯৮৩০১-৬১০০৩

রূপ চর্চা

পুজোয় চাই চকচকে ত্বক

পুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। শপিং নিশ্চয়ই শেষ হয়নি? কিন্তু শপিং করতে গিয়ে ত্বক, চুলের যত্ন ঠিকঠাক নিয়েছেন তো? নাকি ভাবছেন পুজো শুরুর আগে পার্লারে গিয়ে একদিন ফেশিয়াল করেই বাজিমাত করবেন। তা কিন্তু সম্ভব নয়। ত্বক, চুলের ধারাবাহিক যত্নআত্তি দরকার। কয়েকটা ঘরোয়া সহজ উপায়েই নিতে পারেন এই যত্ন। কীভাবে, জানাচ্ছেন সৃষ্টি বিউটি ক্লিনিক অ্যান্ড স্পা-এর বিউটিশিয়ান **শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্ত**

ত্বকের দেখভাল

● ত্বক সুন্দর রাখার মূল উপায় তিনটি। ক্লেনজিং, টোনিং এবং ময়শ্চারাইজিং। এই তিনটি ঠিকমতো করলেই ত্বক সুস্থ থাকবে। তাই প্রতিদিন বাড়ি ফিরে ভাল করে জল দিয়ে মুখ ধুতে হবে। এতে ত্বকের ওপরটা পরিষ্কার হয়ে যায়, এপিডারমিস স্তর আর্দ্র থাকে। দিনে যতবার সম্ভব মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া ত্বকের জন্য খুব উপকারি।

● বিনস, লেটুসপাতা, নিমপাতা, তুলসীপাতা একসঙ্গে ফুটিয়ে বোতলে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। বাইরে থেকে ফেরার পর তুলোয় করে খানিকটা নিয়ে মুখে লাগালে ভেতরের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা টোনিং-এর কাজ করে।

● আলাদা কৌটোয় মেথির গুঁড়ো, আতপচালের গুঁড়ো, চন্দনের গুঁড়ো একটু কর্পূর মিশিয়ে রেখে দিন। প্রতিদিন স্নানের আগে জলের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে হালকা ম্যাসাজ করে নিতে পারেন। এই মিশ্রণ লাগানো যায় হাতে, পিঠেও। তবে কৌটোয় ভরা গুঁড়ো এক সপ্তাহ অন্তর পাল্টাতে হবে। নয়তো ফাংগাস হয়ে ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। প্রতিদিনই করা যেতে পারে ত্বকের এই পরিচর্যা।

● স্নানের পর টোনিং-এর জন্য শসা আর পাতিলেবুর রস সমপরিমাণে নিয়ে ১চামচ গোলাপজল, এক চিমটে কর্পূর মিশিয়ে ত্বকে লাগালে ব্রণ, ফুসকুরি কিংবা অন্য ধরনের র‍্যাশ বেরনোর সমস্যা হয় না। যাদের র‍্যাশ-এর সমস্যা আছে তারা পাতিলেবুর রস কম দিয়ে গোলাপ জল বেশি করে দিতে পারেন। লাগানোর ১০ মিনিট পরে হলে ভাল, নয়তো ৩-৪ মিনিট পরে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিলে ত্বকে দারুণ জেল্লা আসে।

● এত কিছু করার সময় না পেলে ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা গোলাপ জলে মুখ ধুলেও টোনিং ভাল হয়।

● রোদে ঘোরাঘুরি করার ফল ট্যান পড়া। তাই এই ট্যান বা রোদে পোড়া ত্বককে বাঁচাতে একটা প্যাক খুব ভাল কাজ দেয়। এক সপ্তাহে তিনবারও করা যেতে পারে। নিম, তুলসীপাতা, কাঁচা হলুদ, কেওলিন পাউডার, সামান্য কর্পূর জলে মিশিয়ে লাগালে ট্যান কমে যায়। এটা তৈলাক্ত থেকে সাধারণ ত্বকের জন্য উপকারী।

● শুষ্ক ত্বক হলে মধু, পাকা পেঁপে, কেওলিন পাউডার, সামান্য

লেবুর রস মিশিয়ে সপ্তাহে তিনদিন করে লাগাবেন।

● যাদের ইতিমধ্যে মুখে বেশ খানিকটা ট্যান পড়ে গিয়েছে তাঁরা লাগাতে পারেন একটা ঘরোয়া ব্লিচ। এটি তৈরি করতে একটা পাতিলেবুর মাঝখান থেকে কেটে পিছন দিকটা পুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর ওই লেবুর রস চিপে, অল্প জল দিয়ে মুখে, গলায়, কনুইতে লাগালে খুব ভাল কাজ দেয়।

● বেসন, মুলতানি মাটি, মিল্ক পাউডার গুঁড়ো একটা কাঁচা হলুদ, পাউরুটির মাঝখানের অংশ দুধে ভিজিয়ে নিয়ে সব এক সঙ্গে মিশিয়ে সারা মুখে মাখা যেতে পারে। শুকিয়ে এলে হাত দিয়ে একটু ম্যাসাজ করে ভেজা রুমাল দিয়ে মুছে নিতে হবে।

● যারা একান্তই কিছু করে উঠতে পারছেন না তাঁরা ইনস্ট্যান্ট গ্লো আনতে বেসন, টক দই, মধু, কাঁচা হলুদ, আমন্ড বাদাম বাটা, এক চিমটে কর্পূর মিশিয়ে মুখে লাগালে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তফাৎটা বুঝতে পারবেন। ওই মিশ্রণে দেওয়া যেতে পারে, পুরনো বিয়ারও।

● পুজোর সময় একটু তো খোলামেলা পোশাক পরতে চাইবে অনেকেই। তাই যত্ন নিতে হবে হাত, পায়ের-ও, এক্ষেত্রে বেসন, চালের গুঁড়ো, দই, মধু, পাতিলেবু একসঙ্গে মিশিয়ে পায়ে লাগানো যেতে পারে। এই প্যাক লাগানোর আগে সামান্য নুন আর লেবু ঈষদুষ্ণ জলে ফেলে পিউমিস স্টোন দিয়ে ঘষে নিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

● হাতের যত্ন নিতে হলে চালের গুঁড়ো, বেসন, দই, মধু, চন্দন পাউডার, মূলতানি মাটি মিশিয়ে লাগানো যেতে পারে। হাত ধোওয়ার পর অবশ্যই লাগাতে হবে কোনও ময়শ্চারাইজার। আর মনে রাখতে হবে, মুলতানি মাটিতে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধে। যা ত্বকে লাগালে উপকারে পরিবর্তে অপকারই হয়। তাই মুলতানি মাটি ব্যবহারের আগে সব সময় গরম তাওয়ায় তা খানিকটা সেঁকে নেওয়া দরকার।

● স্নানের শেষে প্রতিদিন এক মগ জলে খানিকটা সি সল্ট গুলে মুখ, মাথা বাদ দিয়ে সারা শরীরে ঢাললে সারাদিন তরতাজা থাকা যায়।

চুলের পরিচর্যা

● প্রথমেই যেটা বলা দরকার, তা হল চুলের অবস্থা বুঝে একদিন অন্তর শ্যাম্পু করা খুব জরুরি। প্রতিদিন রাতে কোনও হেয়ার টনিক লাগালে চুল ভাল থাকে।

● মাথায় খুসকি হলে খুব চুল পড়ে যায়। এক্ষেত্রে মুলতানি মাটি, শশার রস বেশ ভাল কাজ দেয়। শুধু খুসকি নয়, অন্য যে কোনও ধরনের ইনফেকশন কমাতেও এর জুড়ি নেই।

● চুলের জন্য প্যাক তৈরি করতে মেহেন্দি পাউডার, ২টো ডিমের সাদা অংশ, কমলালেবু অথবা পাতিলেবুর রস, আমলকি ও শিকাকাই পাউডার মিশিয়ে এই মিশ্রণ স্ক্যাল্পে লাগানোর আগে মধু মেয়োনিজ চুলে দিলে খুব ভাল কাজ দেয়। তারপরে কোনও হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে হবে। এটা ভীষণ ভাল স্পা-এরও কাজ করে।

● চুলের সৌন্দর্য রক্ষায় অয়েল ম্যাসাজও খুব জরুরি। আমন্ড আর অলিভ অয়েল ১:১ অনুপাতে মিশিয়ে লাগালে ভাল কাজ হয়। এটি প্রোটিনেরও কাজ করে।

শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ফোন করুন : ৯৮৩০০০৯৫২৭

কথা ও কাহিনি

আপিস

বাণী বসু

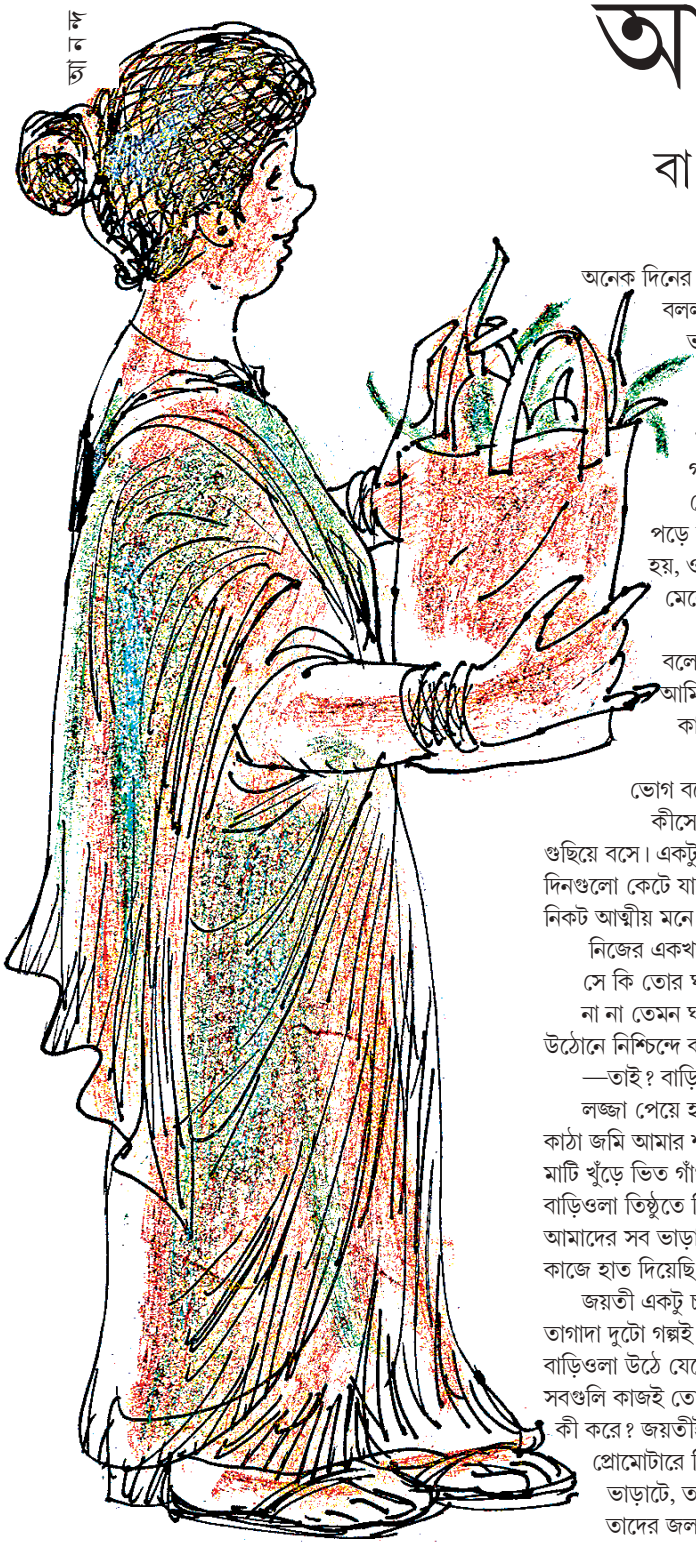

অনেক দিনের বড্ড সাধটুকুনি এইবার বোধহয় মিটল বৌদি, একগাল হাসি মুখে হাসি বলল, শুধু তো বলল না, উবু হয়ে ঘর মুছছিল, কোমর মুচড়ে পাশ ফিরে চোখ ভরে হাসল।

বৌটির এইটাই সবচেয়ে বড় গুণ, সব সময়ে হাসি হাসি মুখ, মেজাজটিও ভাল, মনের কথাগুলো সে বৌদিকে আপন ভেবে হাট করে খুলে বলে। বেশ একটা আলগা শ্রী আছে তার, যখন হাসে চোখ কপাল গাল সবই যেন হাসতে থাকে। তা নয় তো কাজ যে তার খুব ভাল তা মোটেই নয়। ন্যাতা টানার দাগ থেকে যায় ঘরে, বেশ লম্বা মানুষ সে, নুয়ে পড়ে ঝাঁট দিতে তার আলিস্যি আছে। কাপড়ে সাবান লেগে থাকে। বড্ড বলতে হয়, ও হাসি এইখানটায় দাগ থেকে গেল যে, ও হাসি কাপড়গুলো ঝেড়ে মেলো, বাচ্চার জামা কাপড় ভাল করে না ঘষলে স্কিন ডিজিজ হবে যে!

হাসির নিজের কিন্তু ধারণা সে খুব কাজের। বৌদিকে সে বারে বারেই বলে— হাসি থাকতে তুমি ভাব কেন বৌদি? একদিন রান্নার লোক না এলে আমি তোমার কাজ চালিয়ে দোব ঠিক। বিছানা বালিশ দেখে শুনে তোমায় কাচতে দিতে হবে না। আমি নিজেই বুঝে সুঝে নিয়ে নেব।

সেটা কিন্তু সত্যিই। সব কিছু খুব গুছিয়ে দায়িত্ব নিয়ে করে। আর রোগ ভোগ বলে জিনিস নেই মেয়েটির।

কীসের সাধ রে? তার ছেলে এখন চানটান করে গোলাপি হয়ে ঘুমোচ্ছে, জয়তী গুছিয়ে বসে। একটু গল্প করলে হাসি খুব খুশি হয়। তারও এখন দেড় মাসের বাচ্চার দরুণ দিনগুলো কেটে যাচ্ছে এমন ঘরোয়া কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে যে হাসিকেই তার সবচেয়ে নিকট আত্মীয় মনে হচ্ছে।

নিজের একখানা ঘরের সাধ গো বৌদিদি।

সে কি তোর ঘর নেই?

না না তেমন ঘর নয়, নিজের, ভাড়ার ঘর নয়। নিজের মতো থাকতে পারব, নিজের উঠোনে নিশ্চিন্দে কাপড় মেলব, সন্ধেবেলায় বসে হাওয়া খাব...।

—তাই? বাড়ি কিনছিস?

লজ্জা পেয়ে হাসি বলে— কী যে বলো বৌদি! আমাদের আবার বাড়ি! সে কথা নয়। দু কাঠা জমি আমার শউরের সেবা করে পেয়েছি গো। সোনারপুর জানো? সেই সোনারপুরে। মাটি খুঁড়ে ভিত গাঁথা হচ্ছে, তারপর একদিকে একখানা ঘর তুলে উঠে যাব, এখানে তো বাড়িওলা তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না, সে তার সব্বস্ব প্রোমোটারকে দিয়েছে। উঠে যাবার দরুনে আমাদের সব ভাড়াটের হাতে থোক কিছু তুলে দিচ্ছে গো বৌদি। তাইতেই বুক বেঁধে শুভ কাজে হাত দিয়েছি।

জয়তী একটু চমকালো। শউরের সেবা করে জমি পাওয়া আর বাড়িওলার উঠে যাবার তাগাদা দুটো গল্পই সে আলাদা আলাদা করে জানে। গত কয়েকমাস তো এই নিয়েই চলছে। বাড়িওলা উঠে যেতে বলেছে, হুট বলতে কোথায় যাই বলো তো বৌদি। এ ঘর ও ঘর করে সবগুলি কাজই তো আমার কাছে পিঠে নইলে আর ছেলের পড়া টুইশন সব চালাতে পারছি কী করে? জয়তীই বলেছিল তোমরা তো অনেক দিনের পুরনো ভাড়াটে। আজকাল প্রোমোটারে নিলে ভাড়াটেদের কিছু না কিছু দেয়, তোমরাও দাবি করো। ওদের পাঁচঘর ভাড়াটে, তারা জয়তীর পরামর্শের জন্য তো বসে ছিল না। ও সব আজকালকার কেতা তাদের জলভাত। নেহাৎ হাসিটা বড্ড সরল আর ওর রিকশাওলা বরটা রামবোকা

তাই। তবে অন্যরা সজাগ ছিল, তারা তাদের দাবি পেশ করেছিল ঠিকই। কিন্তু সত্যিই যে তাতে কাজ হয়েছে, কিছু হাতে পেয়েছে হাসিরা, এটা একটা খবর।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরের দিকে দেশ হাসিদের। শ্বশুরের বড় ছেলে হাসির বর একটু খোঁড়া, তা হয় তো বা খুঁতো বলেই ভালমানুষ। হাসির মতো সুঠাম চেহারার গুণবতী মেয়ের যে এমন বর কেন জুটল সে রহস্য কোনদিনই ভেদ করতে পারেনি সে। কিন্তু হাসি নিজ গুণে মানিয়ে নিয়েছে। তার বাকি দুই দেওর থাকে দেশে ঘরে, জমি জায়গা যা আছে তাতে তাদের ভাতের কষ্টটা নেই। বছরে একবার করে হাসি দেশে যায়, ফেরে পোড়া কাঠটি হয়ে। ভালমানুষ পেয়ে ওকে বোধহয় সব্বাই খাটিয়ে নেয়। এখানে থাকে একখানা ঘরে। সেখানেই তিনজনের শোয়াবসা, এক কোণে কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে রান্না করা। পাঁচ ভাড়াটে একখানা কলঘর। সেইখানে তার বুড়ো শ্বশুর এসে উঠল। কী ব্যাপার? না শাশুড়ি মারা যাবার পর ছেলের বৌরা তাকে একেবারেই দেখে না। বুড়ো বয়সের শ্বাসকষ্টের রোগ তার, জবু থবুও হয়ে গেছে, তার ওপর তার পা ভেঙে সেরেছে। হাসি বেচারি এখন কাকে বোঝায় যে তার একটা দাওয়া পর্যন্ত নেই। এখানে তার এক ননদ থাকে, তার নাকি তিনখানা ঘর, বর সরকারি আপিসে কাজ করে, সে নিজেও গেঞ্জির কারখানায় যায়। তাকে হাতে পায়ে ধরল। কেউ বুড়োকে আশ্রয় দিলে না। অগত্যা হাসির ওই একখানা ঘরেই শ্বশুরের জন্যে আলাদা খাটিয়া এলো, একে ওকে ধরে বেড প্যান রাবার ক্লথ, কলাইকরা গামলা সব কিছু যোগাড় হল। একটি দিনের জন্যেও কামাই না করে হাসি বৃদ্ধকে শুধু যে সেবা করল তাইই নয়, সারিয়ে তুলল। তার পা ঠিক হয়ে গেল, শ্লেষ্মার রোগ সেরে গেল, বুড়ো তখন দেশ ঘরে ফেরবার জন্যে আঁকুপাকু। যাবার আগে সে নাকি হাসিকে বলে—মা তোমরা আর জয়নগরের জমি জায়গায় দাঁত ফোটাতে পারবে না। ও দিকে যেও না। কেউ জানে না আমি সোনারপুরে দু'কাঠা জমি কিনে রেখেছিলুম অনেক দিন আগে। সেইটাই দানপত্র করে তোমাদের নামে দিয়ে যাব।

এ যেন সেই পুরাতন দিনের রূপকথা। আকাশ থেকে দেবতা নেমে এলেন বর দিতে। তবে সে বর এত তাড়াতাড়ি কাজে লাগবে তা হাসি ভাবেনি। জমিকে চৌরস করে তার জলা জায়গা ভরাট করে তবে না ভিতের পত্তন করতে হয়। সে তো এতগুলি টাকা। কোথায় পাবে গরিব মানুষ। ভেবে রেখেছিল বড় ছেলে বারো কেলাসটা পাশ দিয়ে কিছু রোজগারপাতি করবে, তখন ওসব হবে। তা এদিকে শাপে বর হয়ে এলো প্রোমোটারের টাকা। হাজার পঁচিশ করে নাকি ভাড়াটে প্রতি দিয়েছে।

তা যেন হল, কিন্তু হাসি তোমার কাজ সব এদিকে, বরের রিকশ সেও এদিকে চলে, ছেলেদের পড়াশোনা, স্কুল টুল?

সেটাই তো ভাবছি বৌদি। কী করি!

জয়তীর বুক মাঝখান থেকে দুরুদুরু করছে। হাসির ভাল হলে তার আনন্দ কম হবে না, কিন্তু হাসি চলে গেলে তার কী হবে! অমন বিশ্বাসী লোক, অত সভ্যভব্য!

২

সন্ধেবেলায় শাঁখ বাজিয়ে, ঘরের চৌকাঠে জল দিয়ে দাওয়ায় এসে বসে বৌটি। মেঝে পাকা, দেওয়াল পাকা, খালি মাথার চালটি এখনো টালির। তা থেকে একখান পাখা ঝুলছে। দেওয়ালে হাঁসের গলার মতো ব্র্যাকেটে সাদা আলোর ডুম। মেঝেময় চাটাই পাতা, কেন না এখনো জল উঠছে। নতুন তক্তপোশের ওপর পুরনো তুলো পিঁজে নতুন তোষক বানিয়ে নিয়েছে তারা। তিনটি বালিশ পাশাপাশি। চাটাইয়ের ওপর চটের গদি তার ওপর মাদুর দিয়ে সে শোয়, মাচা করেছে একখানা, একটু ডিঙি মেরে তার নাগাল পেয়ে যায় সে। তার বিছানা মাচার ওপর তুলে রাখে সে দিনের বেলা। পাশে এক চিলতে এক রান্নাঘর, আলাদা রান্নাঘর, সেখানে সে সকালবেলায় ভাতে ভাত রেঁধেছে, খেয়ে দেয়ে চলে গেছে দুই ছেলে, বড় ছোটকে স্কুলে পৌঁছে দেবে। তার বর বিয়ের যৌতুকে পাওয়া রিকশাটি বেচে দিয়েছে। সে এখন ঢাকুরিয়ার বাজারে আনাজ পাতি নিয়ে বসে। ছেলেরা টুইশন কেলাস সেরে বাড়ি আসবে। বর

ফিরে, মুড়ি চা খেয়ে একটু শুয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। খোঁড়া মানুষ, বেশি পারে না বেচারা।

হাসি এখন বাইরের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। তবে ঘরের কাজ তার অনেক বেড়ে গেছে। এক কাঠা আট ছটাক মতো জায়গায় তাদের ঘর তুলেছে তারা। বাকি জমিটার একদিকে একটু ডোবামতো ছিল, সেটাকে গভীর করে কাটিয়ে নিয়েছে, তাতে একটু শিঙি মাছ ছেড়েছে। ডোবার ধারে ধারে বেশ শাকপাতি গজিয়েছে, বাকি জমিটুকুতে আনাজপাতি ফলেছে বেশ। জমিটা ভাল। লাউ, কুমড়ো পেঁপে, উচ্ছে, লঙ্কা, এসব তো আছেই, শশা, চিচিঙ্গের মাচা, শখ করে একটু কপি বুনেছে মদন, তার বর। জমিটায় নিম, পেয়ারা আর একটা আমগাছ আছে। কাটেনি তারা। জ্যান্ত গাছ কাটতে যেন গা কেমন করে, তা ছাড়া কোনও গাছই তো এমনি এমনি নেই, এ মরশুমেই গোছা গোছা করে নিমপাতা বেচেছে মদন, বারোমাস পেয়ারা ফলছে, ছেলেরা খেয়েও বিক্রির জন্যে থেকে যায়। কী সব দাম জিনিসের। গাছের জিনিস পড়তে পায় না। এই বাগানটির সেবা করতে তার অনেক সময় যায়। তা বছর দুয়েকের মধ্যে গেঁজে ভর্তি টাকা নিয়ে সোনারপুরের বাড়িতে ফিরতে লাগল মদন। আনাজপাতি বেচে ভাল লাভ হয়েছে।

—কত হলো দাও শুনে দেখি, বৌটি বলে।

—কত আর! সারা দিনের কষ্ট, জমিতে খাটছি, পাইকারের কাছে খাটছি, বাজারে খাটছি, একটু বসার জায়গা নিয়ে সে কী হুজ্জোতি। থেকে থেকেই তাদের তোলা দাও, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মদন।

বৌ তাকে চা জলখাবার দিয়ে পা টিপতে বসে, ঘুমে ধরেছে মদনকে, সে গভীর ঘুমোয়, পয়সার গেঁজেটি তখনও তার কোমরে লেপটে থাকে।

কেন? বৌ ভাবে। তার কেমন খটকা লাগে, মদন তো এমন ছিল না? তাদের সংসারের নীতি-নিয়মও এমন ছিল না। সে পাঁচ বাড়ি খেটে যা রোজগার করতো তাই দিয়েই চলতো সংসার। তাদের খাওয়া-পরা, ছেলেদের স্কুলেরখরচ, অসুখ বিসুখে হাসপাতাল-ডাক্তার-ওষুধ! মদন যেটুকু আয় করতো তাতে তার বিড়ি, আর টিফিন খরচা বাঁচিয়ে কতটুকুই বা থাকত! সে রিকশা চালানোর আয়টুকু নিঃশেষে বৌয়ের হাতে তুলে দিত। তা থেকেই হাসি আবার তার হাত খরচটা বাঁচিয়ে তাকে ফেরৎ দিত। আজ কেন পয়সার গেঁজে মদনের কোমর ছাড়ে না?

ছেলেরা ঘরে এলো, এক পেট খিদে নিয়ে এসেছে দুজনে, সে তাড়াতাড়ি সকালের জলঢালা ভাত, আলুভাতে, কাঁচা লংকা, পেঁয়াজ দিয়ে তাদের বসিয়ে দেয়। ছোট ছেলে বলে মোড়ের মাথায় বেশ বেগুনি ভাজছে মা, ক'টা আনি না?

—বেশ আন, হাসি হাসি মুখেই সায় দেয়। কিন্তু টাকা?

গোটা দশেক টাকা! তা-ও তো তার হাতে নেই! বড় ছেলেকে বলে— বাপের কোমরে গেঁজে থেকে টাকা বার করে নে।

তা করতে গেলে মদনের ঘুম ভেঙে যায়, এবং সে চিৎকার করে হাত পা ছুঁড়ে জেগে ওঠে।

—তোর কি বাপের টাকা? না বাপের জমি? টাকা আমি হাড়ভাঙা খাটুনিতে রোজগার করেছি, খবর্দার হাত দিবিনি... কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে মদন উঠে বসে, সামনে হতভম্ব দুই ছেলে।

কী ব্যাপার! মদন বুঝি একটু নরম।

ছেলেরা কথা বলে না। বাপের এ মূর্তি তারা কোনওদিন দেখেনি।

—বলবি তো রে হারামজাদা, ব্যাপারটা কী?

ছোট কোনওমতে তার বেগুনির আর্জিটুকু পেশ করে।

—তা সে কথা বললেই হয়, একেবারে হাত সাফাইয়ের জোগাড় না করলেই হতো না?

খিঁচিয়ে মিচিয়ে সে গোটা দশেক টাকা বার করে দেয়। বেগুনি আসে, চা করে হাসি, খাওয়া হয়, তবে হাসির খাওয়া হয় না। ছোট একবার বলেছিল— মা তোমার রাখলে না? সে কোনও জবাব পায়নি।

মদন যে আজকাল একটু টেনে আসছে সে কথা বড় ছেলেই মাকে জানাল। পান খেয়ে আসে দেখছো না? তাইতে গন্ধটা ঢাকা পড়ে যায়।

রাতে হাসির ঘুম ভেঙে যায়, সে দরজার গোড়ায় গিয়ে বসে। খোলবার উপায় নেই, বিনবিন করছে মশা। ঘরে মশার ধূপ জ্বালানো আছে, তাই। তবু দরজায় পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসে থাকে সে। না, তার বাপের টাকাও না, বাপের জমিও না। কিন্তু শ্বশুর ও জমি দিয়েছেন তার সেবায় খুশি হয়ে, সেবাটি না পেলে, খুশিটুকু না থাকলে কী হতো বলা যায় না! খুশির কথা অবশ্য সে ভাবেনি, মায়ার কথা ভেবেছিল, কর্তব্যের কথাও। তাই প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিল, শ্বশুর সে কথা পঞ্চমুখে বলেছিলেন, কিন্তু জমিটুকু মদনের নামেই হল। সে অবশ্য ঘুণাক্ষরেও কিছু ভাবেনি। কিন্তু এখন তো ভাবনা ধরে গেল। টাকা? তা-ও তার নয়। প্রোমোটারে যে টাকা ক্ষতিপূরণ দিল তা তাদের ফ্যামিলিকে দেয়, কিন্তু টাকাটা এলো বাড়ির ব্যাটাছেলে মদনের নামে। যদিও বাড়ি ভাড়ার টাকা থেকে শুরু করে খাই-খরচ, অবর সবর, ওষুদপালা চিরকাল সে, হাসি, গতরে খেটে কামিয়ে এনেছে। আর মদন যে টাকায় তার আনাজপাতির ব্যবসা শুরু করল, তা-ও পুরোপুরি রিকশ বেচার টাকা, সেও তো হাসির বাপই দিয়েছে। এই আম, নিম, পেয়ারা গাছগুলি, কুমড়ো, লাউ, শশার মাচা... এসবের পেছনে যে খাটুনি, মগজ, জেদ তা-ও পনেরো আনাই তো হাসিরই। সকাল বিকেল বাজারে বসে আর একটু মাটি কুপিয়ে কপির চারা বসাতে না বসাতেই স-ব মদনার একার হয়ে গেল? আর একটু পয়সা আসতে না আসতেই মদনা সোজা চলে গেল শুঁড়ির ঘরে?

মেজাজ ভাল দেখে সে একদিন বেরোবার সময়ে বলে দিয়েছিল— নেশা করো না। ওতে সব্বোনাশ হয়।

কে বললে আমি নেশা করি? মদন একটু তেতে উঠেছিল।

হাসি বলে—আমি জানি। এখনও আমার কথা শোনো, নেশায় মজলে এত কষ্টের ঘর সংসার সব ছারেখারে যাবে।

—কত যে কষ্ট, শরীল যে বয় না মোটে— তা তো আর জানো না? ওই গায়ের ব্যথা মারতেই মাঝে মাঝে একটু আধটু খাই।

শরীরের কষ্ট? গতরের ব্যথা? হাসি জানে না? পাঁচ সাত বাড়ি ঘর মুছে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, কোথাও আবার রান্না করে, নিজের সাত নোংরা ঘরটিতে এসে আবার এক প্রস্ত মোছা-মাজা-কাচাকুচি-রাস্তার কল থেকে জল তুলে আনা—রান্নাবান্না যেটুকু যা হোক— গতরের ব্যথা হাসি জানে না?

৩

জয়তীর ছেলেটি বছর দুইয়ের হয়ে উঠেছে। দিব্যি হাঁটছে, আধো আধো কথার ঝুড়ি আর সেই সঙ্গে দস্যিগিরি। বিকেল বেলা

অফিস থেকে ফিরে এসে জয়তী দেখে টেবিল হাঁটকানো পাঁটকানো, ছেলে বাবা মায়ের মতো পড়া শোনা করেছে, বিছানার চাদর মাটিতে, মেঝের কার্পেট বিছানায়, সেই পদধূলিলাঞ্ছিত কার্পেটের ওপর ঘুমিয়ে আছে ছেলে, তার বাড়ির নিয়ম নীতি পছন্দ হচ্ছে না, সে নিজস্ব ইনটিরিয়র ডেকোরেশন চালু করেছে, নিজস্ব রুটিনও, রান্নাঘরে কী যেন উল্টেছে, কাঁচ টাচ হবে, কেন না ছায়া নামে ছেলের লোকটি কী সব ঝাঁটাচ্ছে, আর কিনকিন আওয়াজ হতে থাকছে। জয়তী বেচারি চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঝাঁটা হস্তে বেরিয়ে এসে ফিরিস্তি দেয় সারা দিনের, তার নিজের কাজেরও বটে, বাচ্চার কার্যকলাপেরও বটে! তার মুখ গোমসা। সে বাচ্চাকে কনট্রোল করতে পারেনি। বাচ্চাই বরং তাকে একপেয়ে খাড়া রেখেছে। রাত আটটা পর্যন্ত তার ডিউটি। সে আগে আগেই বিধ্বস্ত হয়ে চলে যায়। তার আগে, বাবু এলে তাঁকে নিজের সারাদিনের খোয়ারের কথা বিশদে বলে, এবং বাবুর প্রতিক্রিয়া হয়, যে মা ছেলেকে দেখাশোনার সময় দিতে পারে না, লোকটিকে পর্যন্ত চালাতে যে শেখেনি তার অত অফিসের শখ করে হাসে।

জয়তী বলে— খুব সুখেই আছিস তা হলে! বাহ! খুব ভাল।

বৌদিদি সব সময়েই তার ভাল চেয়ে এসেছে, কিন্তু তার আজকের কথাগুলো কেমন শুকনো শোনাল।

হাসি বলল— সুখ মনে করলেই সুখ বৌদিদি, আবার দুঃখু মনে করলে তাই। তুমি কেমন আছো?

দেখতে পাচ্চিস না? এই মহারাজের জন্যে আজও অফিস কামাই হলো। কোনও জিনিস বাড়িতে গোটা রাখতে দিল না। সব টুকরো টুকরো।

ও মা, দস্যি ছেলেই তো ভাল। তারা বড় হলে জজ ব্যালেস্টার হয় বৌদি।

ও যদ্দিনে জজ কি ছাইয়ের মাথা হবে তদ্দিনে আমি আর ইহজগতে নেই।

ষাট ষাট বৌদি ও কী কথা! তা তুমি একটা ছেলের লোক রাখো। ছোট্ট সংসার তোমার। এইটুকুনি আর সে দেখে রাখতে পারবে না? অবিশ্যি হ্যাঁ, বিশ্বাসের লোক পাওয়া খুব মুশকিল—

রাখিনি নাকি! একটার পর একটা লোক পাল্টাচ্ছি। দিনে

এমন সময়ে বেল বাজল। আথিবিথি করে ছুটে গিয়ে জয়তী দরজা খুলে দেয়, হাসি মুখে হাসি ঢুকে আসে। তার হাতে একটি থলি, গায়ে র‍্যাপার। সে ভেতরে এসে বৌদিকে প্রণাম করে, থলি থেকে তার বাগানের লাউ আর নারকোল নামিয়ে রাখে, বৌদি আমার নিজের হাতে তৈরি গো! খেয়ে দেখো।

কেন?

পরদিন জয়তী এ বছরের আঠারোতম ক্যাজুয়াল লিভটি নিয়ে ফেলে, বাচ্চার কুটিপাটি হাসি দেখেও তার ডিপ্রেশন ঘোচে না, কেন না ছায়া আসেনি। তার কোনও বদলিও এখনও সেন্টার থেকে পাঠানোর নাম করছে না। বাবু যথা সময়ে খাওয়া দাওয়া করে অফিসে বেরিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, তারা দুজনেই একই গোত্রের কাজ করে, মাইনে কড়িও প্রায় একই, দুজনের উপার্জন মিলেছে বলেই সংসারটি ভাল ভাবে চলছে। সে না কাজ করলে সাচ্ছল্য ভ্যানিশ!

এমন সময়ে বেল বাজল। আথিবিথি করে ছুটে গিয়ে জয়তী দরজা খুলে দেয়, হাসি মুখে হাসি ঢুকে আসে। তার হাতে একটি থলি, গায়ে র‍্যাপার। সে ভেতরে এসে বৌদিকে প্রণাম করে, থলি থেকে তার বাগানের লাউ আর নারকোল নামিয়ে রাখে, বৌদি আমার নিজের হাতে তৈরি গো! খেয়ে দেখো।

বাচ্চা ভেতরে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

—ও মা! তোমার সনকু এত্ত বড় হয়ে গেল! বলতে বলতে হাসি ছুট্টে গিয়ে তাকে কোলে নেয়। একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল সনকু, কিন্তু নতুন মানুষ তার আবার একগাল হাসি, সে তার জন্যে কোনও বিশ্রী চলতি খেলনা আনেনি, এনেছে বাগানের কচি শশা, সে গুলো হাতে পেয়ে সনকু কী করবে ভেবে পায় না। একবার তাদের গড়িয়ে দেয়, আবার তুলে নিয়ে নিজের বালিশে পর পর শুইয়ে দেয়, বিছানার চাদরের তলায় লুকিয়ে খিলখিল

দেড়শো টাকা করে গুনে দিচ্ছি তার ওপরে এ দিকের কাজ, রান্নার কাজ, জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছুই সামলাতে পারছি না। তোর দাদা তো আমাকে ধুলধাবাড়ি করে বকছে, আমি নাকি কিচ্ছু পারি না। আচ্ছা, আমি কী করবো বল তো? পুরনো কাজের লোককে পেয়ে আহত নারী তার যাবতীয় ব্যথা উগরে দেয়।

হাসি বলে— তা বৌদি, সনকু তো দিব্যি আমার কোলে এলো, পোষ মেনে গেল। আমিই যদি দেখি ওকে, তুমি না হয় সেই দরুণ টাকাটুকু আমাকেই দিলে!

সে কী রে! জয়তী অবাক মানে, তুই যে সেই সোনারপুরে সেটল করেছিস, এত ফুলফুলুরি ফলাচ্ছিস, নিজের বাড়ি, নিজের সংসার— সে সব ফেলে...

সে সব গুছিয়েই আসব। সোনারপুর তো কখানা মোটে ইস্টিশন!

ছেলেরাও ইস্কুলে আসবে, আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসব, তুমি আপিস বেরোবার আগেই এসে পড়ব, আর তুমি ফিরে এলে তোমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আবার চলে যাব। দু'দুটো ছেলে মানুষ করেছি, ও আর আমার কাছে এমন কি!

ঠিক তো? এত কষ্ট আবার করতে যাবি কী জন্যে?

হাসির কথা ভদ্দরলোকের এক কথা বৌদি, রেখেই দ্যাখো না! হাসি নি-হাসি মুখে বলে, কী জানো, তোমারও যেমন আপিস, আমারও তেমনি একটা আপিস নইলে আর চলছে না।

ভূ ত ভ বি ষ্য ৎ

রাশিফল। আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ এই তিনমাস কার ভাগ্যে কী আছে জেনে নিন। লিখছেন শ্রীভৃগু (অনাদি)

মেষরাশি
আনন্দের পরিবেশ থাকলেও আনন্দের অনুভূতি কম থাকবে, স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে, তবে ব্যয়-বৃদ্ধি পাবে। সঠিকভাবে ব্যবসায় অর্থ লগ্নী করলে লাভবান হবেন। শুভ রং : সাদা ও লাল ; অশুভ রং : কালো ; শুভ খাদ্য : দালিয়া, ছানা, মাছ, আটার রুটি ; অশুভ খাদ্য : পুঁইশাক, বেগুন; শুভ সংখ্যা : ৫।

বৃষরাশি
বিদেশ যাত্রা যোগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভে সমস্যা হতে পারে। তাই খেয়াল রাখতে হবে সেদিকে। চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি ও আনন্দ লাভ। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। শুভ রং : আকাশি ; অশুভ রং : কালো ; শুভ খাদ্য : নিরামিষ ; অশুভ : আমিষ ; শুভ সংখ্যা : ৪।

মিথুন রাশি
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এবং বিবাহ। তবে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তা না হলে শারীরিকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কিছু ব্যবসায়ী ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়বেন। বিশেষভাবে কর্মী প্রধান সংস্থা এবং যাত্রায়। শুভ রং : সাদা ; অশুভ রং : সবুজ; শুভ খাদ্য : মাংস, রুটি ; অশুভ খাদ্য : ময়দা, ফল, চিংড়ি মাছ। শুভ সংখ্যা : ৬।

কর্কট রাশি
ধীর ও স্থির হলে কর্মজীবনে সাফল্য আসবে, বিশেষ করে জল জাতীয় ব্যবসায়, খাদ্য ব্যবসায় শুভ হবে। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে নতুনভাবে সংযোগ বৃদ্ধি ঘটবে। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকলে শুভ হবে। শুভ রং : একাধিক রং ; অশুভ রং : কালো ; শুভ খাদ্য : মাছ ; অশুভ খাদ্য : ডিম ; শুভ সংখ্যা : ৩ ।

সিংহ রাশি
উচ্চস্থান থেকে আঘাত প্রাপ্তির যোগ, দূর ভ্রমণ নিষেধ, অর্থ প্রাপ্তি, আত্মীয় সমাগম, নতুন বন্ধু লাভ, তবে মেলামেশার ক্ষেত্রে সতর্ক। বিবাহের ক্ষেত্রে শুভ, সন্তান, নেবার জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শুভ রং : পিংক, সাদা ; অশুভ রং : লাল, হলুদ ; শুভ খাদ্য : মাংস, সামুদ্রিক মাছ ; শুভ সংখ্যা : ২।

কন্যা রাশি
শিল্প কাজে যুক্ত এমন জাতক/জাতিকাদের ক্ষেত্রে শিল্প কাজের ক্ষেত্রে অর্থলগ্নী করলে অশুভ হবে। হঠাৎ আত্মীয় বিয়োগ হওয়ার যোগ আছে। ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে, প্রণয় সূত্রে বিবাহ শুভ হবে। বিদেশ যাত্রা যোগের সম্ভাবনা প্রবল। শুভ রং : মেরুন ; অশুভ রং : নীল ; শুভ খাদ্য : দালিয়া, ছোট মাছ, রুটি ; অশুভ খাদ্য : মুসুর ডাল, টমেটো, চিংড়ি মাছ ; শুভ সংখ্যা : ৬।

তুলা রাশি
আত্মীয় হইতে বিশেষভাবে সাবধান। ভ্রমণে শুভ, তবে জলপথ বাদে। উচ্চ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ সময়, বিয়ের ক্ষেত্রে ছক বিচার করে তবেই বিয়ে শুভ, কারণ বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সন্তান নেবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত। শুভ রং : সাদা, আকাশি ; অশুভ রং : মেরুন ; শুভ খাদ্য : হলুদ ছাড়ারান্না ; অশুভ খাদ্য : হলুদ দেওয়া রান্না ; শুভ সংখ্যা : ৪।

বৃশ্চিক রাশি
খাদ্য জাতীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ। কর্মী প্রধান ব্যবসায় অশুভ, শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করলে শুভ হবে। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক কারণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিজীবিদের ক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি। শুভ রং : হলুদ ; অশুভ রং : লাল ; শুভ খাদ্য : মুরগির মাংস ; কলাই ডাল, মাছের মাথা ; অশুভ খাদ্য : বেগুন, পুঁইশাক, চিংড়িমাছ ; শুভ সংখ্যা : ৬।

ধনু রাশি
অর্থপ্রাপ্তি। সাংসারিক জীবনে আনন্দ লাভ। সন্তানদের শিক্ষার জন্য চিন্তা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার্থীদের বাইরে থাকার জন্য শুভ সময়। শিক্ষা কর্মে যুক্ত এমন ব্যক্তিরা বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে অর্থ লগ্নী করলে, শেয়ার মার্কেটে নয়। শুভ রং : নীল ; অশুভ রং : ধুসর ; শুভ খাদ্য : ডিম, টমেটো, পোস্ত ; অশুভ খাদ্য : সামুদ্রিক মাছ, মাছের ডিম ; শুভ সংখ্যা ৫।

মকর রাশি
মাসের প্রথম দিক আনন্দের মধ্যে দিয়ে শুরু হলেও শেষের দিকে মানসিক বিষণ্ণতা হতে পারে। দূর ভ্রমণ নিষেধ, বিশেষভাবে পাহাড়ি এলাকায়, কারণ উচ্চ স্থান থেকে আঘাত প্রাপ্তির যোগ আছে। ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নী করলে শুভ হবে, প্রিয়জন বিয়োগ হওয়ার যোগ আছে। ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য শুভ। শুভ রং : হলুদ, সবুজ, পিঙ্ক ; অশুভ রং : ধুসর, কালো ; শুভ খাদ্য : মাছ, ডাল, পালংশাক ; অশুভ খাদ্য : ফুলকপি, মিষ্টি, মাছের ডিম ; শুভ সংখ্যা : ৮।

কুম্ভ রাশি
আনন্দের মধ্যে থেকে হঠাৎ ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার যোগ আছে। এম. বি. এ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। এম. টেক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অশুভ। বাড়িতে আত্মীয় সমাগম, অর্থপ্রাপ্তি, স্বাস্থ্য উন্নতি, আরোগ্য লাভের যোগ। শুভ রং : সাদা ; অশুভ রং : লাল, নীল ; শুভ খাদ্য : মটরের ডাল, লাউ, বাঁধাকপি, মাছ ; অশুভ খাদ্য : মাংস, দই, মুসুর ডাল; শুভ সংখ্যা : ৬।

মীন রাশি
প্রণয় সূত্রে বিয়ের যোগ আছে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেম, ভালবাসা থেকে সাবধান থাকতে হবে। দুর্নাম বৃদ্ধি, মানসিক অশান্তি হতে পারে। স্বাধীন কর্মে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের শুভ হবে। হঠাৎ বিয়ের নতুনভাবে যোগাযোগ ঘটবে এবং অর্থ প্রাপ্তি হবে। শুভ রং : পিঙ্ক, সাদা ; অশুভ রং : মেরুন, সবুজ ; শুভ খাদ্য : রুটি, ছোলার ডাল, দালিয়া পোস্ত ; অশুভ খাদ্য : টকদই, ডিমের কুসুম ; শুভ সংখ্যা : ৯।

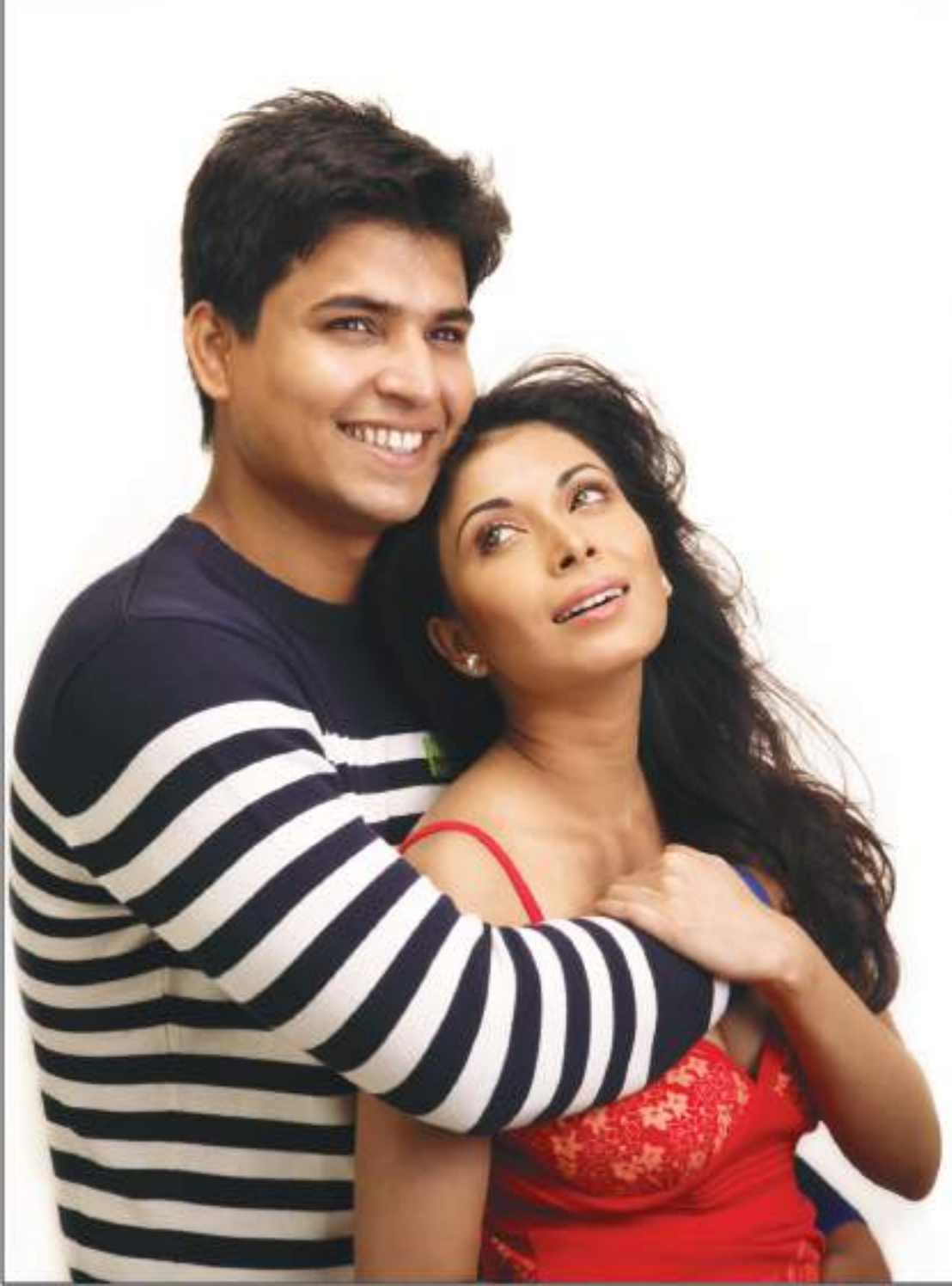

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida® 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

Suvida "RNI Title Code: WBBEN 14251

হ্যাঁ, আমি নিজেই
সব সিদ্ধান্ত নিই

Suvida®

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

গর্ভনিরোধক বড়ি

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।